ব্রজগাথা।

মর্ম্মগাথা, প্রেমগাথা, অমিয়গাথা

ও

নারীধর্ম্মপ্রণেত্রী

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী সরস্বতী

প্রণীত।

"চৈতন্যলীলা সুমধুর, কৃষ্ণলীলা সুকর্পূর,
দুঁহে মিলি হয় সুমাধুর্য্য।
সাধু গুরু-প্রসাদে, তাহা যেই আস্বাদে,
সেই জানে মাধুর্য্যপ্রাচুর্য্য॥"

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

১৩০৯

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

কলিকাতা,
১৭ নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন,
"কালিকা ষ্টীম্-মেসিন্-যন্ত্রে"
শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

উৎসর্গ।

আমি বনলতা এই সংসার মাঝার,
দিয়াছেন পিতা মাতা যেই সহকার—
সেই প্রেম-তরুবরে করিয়া আশ্রয়,
উঠিতেছে এ হৃদয়ে কত তানলয়।
কত ভাবে কত রূপে,
হৃদি মথি চুপে চুপে,
মিশেছে বিশ্বের বুকে সে কাকলীচয়।
ইহা তারি এক কণা, ছানিয়া পরাণ—
আমার সে তরুবরে দিনু অর্ঘ্যদান।

নগেন্দ্রবালা।

ভূমিকা।

ব্রজগাথা-রচয়িত্রী শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী বঙ্গীয় সাহিত্য সংসারে সুপরিচিত। ইহাঁর রসময়ী লেখনীনিঃসৃত মর্ম্মগাথা, প্রেমগাথা এবং অমিয়গাথার দ্বারা ইহাঁর কবি-প্রতিষ্ঠা বঙ্গব্যাপিনী হইয়াছে। বঙ্গের অনেক সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র এবং সাময়িক পত্রিকা এবং বঙ্গীয় সাহিত্যজগতে কৃতী ব্যক্তিগণ মুক্তকণ্ঠে ঐ পুস্তকগুলির সুখ্যাতি করিয়াছেন এবং লেখিকাকে সাগ্রহে সাধুবাদ প্রদান করিয়াছেন। ফলতঃ যাঁহার লেশমাত্র সহৃদয়তা আছে, তিনি গাথাত্রয়ের রচনার সুকুমার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইবেন ইহা বলিলে অতিশয়োক্তি দোষে দূষিত হইতে হয় না। গাথাত্রয়ের কবিতার মত অক্লিষ্ট অব্যাজমনোহর সরলতরল রচনা আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে নিতান্ত বিরল। উহার বিশেষত্ব এই যে উহাতে পরিচ্ছদের এবং অলঙ্কারের কোন আড়ম্বরই নাই, অথচ উহার নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যে হৃদয় দ্রবীভূত হয়। মহাকবি ভারবির

"ন রম্য মাহার্য্য মপক্ষতে গুণম্"

এই চিরপ্রসিদ্ধ উক্তি নগেন্দ্রবালার কবিতার প্রতি সম্পূর্ণ প্রযোজ্য। ইহাতে কৃত্রিমতার লেশমাত্র নাই। কবিতা হৃদয় হইতে নিঃসৃত হইয়াছে, সুতরাং স্বতঃই হৃদয়ে প্রবেশ লাভ

করে। অল্প এবং অতি সহজ কথায় রাশি রাশি ভাব সান্দ্রীকৃত হইয়া কবিতাগুলি পাঠকের কল্পনাকে যেন অনন্ত-ভাবরাজ্যের নিভৃততম, অতর্কিত এবং অনাবিষ্কৃত প্রদেশে লইয়া যায়, লুপ্তভাবগুলিকে পুনরুদ্ধৃত এবং সুপ্তভাব গুলিকে প্রজাগরিত করিয়া দেয়। উহার অপ্রগল্ভ মাধুরী কেবল অনুভবের বিষয়, উহা বিশ্লেষণক্ষম নহে।

ইতিপূর্ব্বে যে তিন গাথা প্রকাশিত হইয়াছে, ব্রজগাথার কবিতা সেগুলির রচনা হইতে ভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত। রচয়িত্রী তাঁহার স্নেহময় স্বামীর সদ্দৃষ্টান্তে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া বৈষ্ণবশাস্ত্র এবং প্রেমপ্রধান প্রাচীন বৈষ্ণব কাব্যের রীতিমত অনুশীলন করিয়াছিলেন এবং সেইভাবে অনুভাবিত হইয়া তাঁহার দীক্ষাগুরু শ্রীমন্নিত্যসখা মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আদেশে বৈষ্ণব কবিগণের পদাঙ্ক অনুসরণ পূর্ব্বক ব্রজগাথা রচনা করিয়াছিলেন। কেবল ভাবে নহে, ভাষাতেও ব্রজগাথা প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদিগের প্রদর্শিতপদবী অনুসরণ করিয়াছে। সুমধুর ব্রজবুলি আয়ত্ত করিয়া উহার যথাযথ প্রয়োগ দ্বারা রচয়িত্রী কাব্যের মাধুরী কিরূপ ফুটাইয়াছেন, সহৃদয় পাঠক পাঠমাত্রেই উহা বুঝিতে পারিবেন।

ব্রজগাথা ধর্ম্মসম্বন্ধে সাম্প্রদায়িক হইলেও কাব্যাংশে পূর্ব্বোক্ত তিন গাথা অপেক্ষা হীনকল্প নহে। নায়ক নায়িকাগণের উক্তি প্রত্যুক্তির চতুরতা, সরসতা এবং নাটকীয় ছটা ইহার সৌন্দর্য্যে প্রধান উপাদান। আদি রসাত্মক হইয়াও এই নর্ম্মোক্তি

এরূপ মর্য্যাদা-সংযত হইয়াছে যে, উহা মার্জ্জিত নব্য রুচিরও কোন অংশে অননুমোদনার্হ বোধ হয় না। সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ হইলেও ব্রজগাথার স্থানে স্থানে সার্ব্বভৌমিক আধ্যাত্মিক ভাবের সুন্দর বিকাশ দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত হইল।

"বৃথা কেন কর রোষ, মোর তরি বিনা আর
কভু না পারিবে হতে এ দুরন্ত নদীপার,
শুনলো শপথি তোর,
প্রতি ঘাটে তরি মোর,
লক্ষ লক্ষ জনে নিতি করিতেছে নদীপার,
মোর তরি বিনা সখি, কারো গতি নাহি আর।

"তাই বলি মিছা কেন বাড়াও বিবাদ আর,
বিলম্বে কি ফল, এস করেদি যমুনাপার,
তোদের ওরূপ রাশি
আমারে পরালে ফাঁসি,
তোদের না করি যদি আজ এ যমুনা পার,
আকুলে আমার নায় কে তবে চড়িবে আর?

অন্যাপদেশগর্ভ এইরূপ উদাহরণ কাব্যের প্রায় প্রতি তরঙ্গেই সুলভ এবং তদ্দ্বারা কাব্যের উৎকর্ষ বহুপরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে।

শ্রীরাধিকার নির্ম্মল প্রেমই ব্রজগাথার প্রতিপাদ্য বিষয়। ঐ প্রেমের চিত্রাঙ্কনে শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী যেরূপ কৃতিত্ব

প্রদর্শন করিয়াছেন, আধুনিক বঙ্গীয় সাহিত্যে উহাঁ অতুলনীয় বোধ হয়। ফলতঃ নগেন্দ্রবালার রাধিকাকে বৈষ্ণব কবিচূড়ামণি চণ্ডীদাসের রাধিকার নব্য এবং সময়োচিত সংস্করণ বলা যাইতে পারে।

নগেন্দ্রবালার গুণগ্রাহী সহৃদয় পিতা শ্রীযুক্ত বাবু নৃত্যগোপাল সরকার মহাশয় কন্যার এই সদ্‌গ্রন্থ প্রণয়নে অত্যন্ত প্রীত হইয়া আগ্রহ সহকারে উহা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছিলেন এবং উহা প্রকাশ করিবার জন্য তাঁহাকে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়াছিলেন। বৈষ্ণব সাহিত্যবিশারদ এবং বঙ্গীয় সাহিত্য সেবকদলের অগ্রণী শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী এম, এ মহাশয়ও ব্রজগাথা অংশতঃ পাঠ করিয়া অনুকূল মত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ধবলেশ্বর-কুটীর
আঠগড়রাজ্য—কটক
৯—১০—০২

শ্রীরাধানাথ রায়।

সূচী।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।

ব্রজগাথা।

প্রথম তরঙ্গ।

ব্রজগাথা।

(শ্রীগৌরচন্দ্র)

১

গোরারূপ কত মনোহর,
জগতে তুলনা তার,
খুঁজিয়া মিলেনা আর,
সে যে গো নবীন নটবর।
ঊষার তপন ছানি,
তা হ'তে লাবণ্য আনি,
মাখাইলা বিধি চারু কায়।
কুসুম জিনিয়া জনু,
কোমল করিলা তনু,
মরি মরি কি মাধুরী তায়!

২

হেরি সেই রূপছটাচয়,
অধীর ভকতগণ,
হ'য়ে প্রেমে অচেতন
রাঙা পদে বিকায় হৃদয় ।
কিবা মনোহর রূপ,
কেবল প্রেমের কূপ,
শুধু তাহে প্রেম উথলায় ।
হেরিলে সে চারু মুখ,
উথলিয়া উঠে বুক,
বিমোহিত ভকত-হৃদয় ।

৩

কটীতটে পীতবাস বাঁধা
গলে বনমালা ভায়,
নূপুর শোভিছে পায়,
ভকতের লাগিল গো ধাঁধা ।
কোকিল গঞ্জিত স্বর,
গতি অতি মনোহর,

ভক্তবৃন্দ না পাওল থেহ
শুনিতে গো গোরানাম,
উথলে হৃদয়-ধাম,
লোমাঞ্চিত ভকতের দেহ।

৪

সেই প্রেম-চাহনীর ফাঁদে
ভকতের কিবা কথা,
পাপী তাপী ভুলে ব্যথা,
দাস হ'তে পদে সবে কাঁদে।
ব্রজেতে সে ছিল শ্যাম,
নবদ্বীপে গোরা নাম,
নাম-প্রেম বিলাবার তরে,
স্বরূপ গোপন করি,
রাধা ভাব কান্তি ধরি,
অবতীর্ণ নদীয়া নগরে।
বালা কবে সেই পায়,
বিকাইবে আপনায়,
কবে ঠাঁই পাবে পদোপরে।

উৎকণ্ঠিত শ্রীগৌরাঙ্গ।

আজু কেন গোউর-কিশোর,—
অবনত মাথে বসি,
মলিন বদন শশী,
কার ভাব-রসে পঁহু ভোর।
উজর বরণ হেন,
কাজরে ভরল কেন,
কেন ঘন ত্যজে নিশোয়াস ?
কভু আন মনে চায়,
কভু করে হায় হায়,
কভু বা চাহত নীলাকাশ।

২

কভু রোয় ধরিয়া ধরণী,—
কভু শিরে করি ঘাত,
বলে "কাঁহা প্রাণনাথ"
বিলাপেতে বিদরে অবনী।

কভু সখা জনে চায়,
বলে "আন বঁধুয়ায়,
নতু মোর রহেনা জীবন"।
ক্ষণে হয় জ্ঞানহারা,
কভু বা পাগলপারা,
কাহে গোরা হওল এমন?

৩

পঁহু ভাব করি দরশন,
সবে প্রেমে মাতোয়ারা,
সবাই আপনা হারা,
রোয়ইত সহচরগণ।
নবদ্বীপ শান্তিপুর,
গোরা-প্রেমে ভরপুর,
প্রেম-স্রোতে ভাসল ধরণী
যত নবদ্বীপ-বাসী,
পিরীতি পাথারে ভাসি,
না জানই দিবস রজনী।

৪

কি খেলা খেলই গোরাশশী,
সবে হরিনাম দিল,
আচণ্ডালে উদ্ধারিল,
ত্রিজগত উঠল উছসি ।
গোলোক মাধুরী যত,
পঁহু দেখাইলা তত,
কিবা ভেল উৎকণ্ঠা অপার ।
বঁধু বিনা রাই যেন,
রোয় গোরারায় হেন,
লোর ঝরে নয়নে বালার ।

শ্রীগৌরাঙ্গের মান।

গদাধর মুখ চাহি ফেলিয়া নয়ন লোর,—
বলে গোরা "কাঁহা নিশি বঞ্চল-বঁধুয়া মোর !
সাজানু বাসর ঘর গাঁথিনু মোহনমালা,
আমারে বঞ্চিত করি কোথায় রহিল কালা।
নিশা অস্তমিত ভেল বাড়িল বিরহ জ্বালা,—
কতবা সহিব ব্যথা হাম আহিরিণী বালা"।
পুন ঊর্দ্ধনেত্রে চাহি জুড়িয়া যুগল কর,—
বলে "বঁধু কাছে এস কেন কর জর জর ?"
প্রভুর বিভল ভাব নেহারি ভকতগণ,
বলে "কৃষ্ণ আসে ওই ত্যজ অশ্রু বরিষণ।"
শুনি কহে "আশে ছাই দিয়াছে সে অবলার,
আমার কুঞ্জেতে তারে দিসনে আসিতে আর।
সেও ভাল কেঁদে কেঁদে যদি প্রাণ হয় ছাই,
তবু সখি সে শঠেরে আর না দেখিতে চাই।

আমারে বঞ্চিত করি বঞ্চিল সে আনমনে,—
এজীবনে তার মুখ না হেরিব দুনয়নে।
সে বড় নিঠুর সখি! বুঝেনা পিরীতি-গাথা।”
এত বলি ধরা লিখে আনত করিয়া মাথা।
রাধা ভাবে মানে ভোর নয়নে বহিছে ধারা,
সে মাধুরী হেরি বালা হওল আপনাহারা।

দ্বিতীয় তরঙ্গ।

পূর্ব্বরাগ।

সখীর প্রতি শ্রীমতী।

১

সখি ! কিবা হইল আমার ?
রহিতে না পারি ঘরে,
পরাণ কেমন করে,
নিতি ঝুরি গুণ কালিয়ার।
কদম্ব-তলেতে হায়,
সদা মোর চিত ধায়,
যেখানে মোহনবাঁশী বাজে অনিবার।

২

কিবা মোরে পাইল তথায় ?
টানে প্রাণ টানে মন,
ছুটে যায় দুচরণ,—
কে যেন লো ডাকে "আয় আয়"।
কি যে সে করিল মোর,
ভাবিয়া না পাই ওর,
এ সারা হৃদয় ভরা শ্যামের ছটায়।

৩

শ্যাম মোর সিঁথার সিন্দুর,--
শ্যাম প্রাণ শ্যাম জ্ঞান,
শ্যাম ধ্যেয় শ্যাম ধ্যান,
আমি পা'র নূপুর বন্ধুর।
সে জীবন সেই দেহা,
সে মোর হৃদয় লেহা,
এ সারা ধরণী দেখি শ্যামে ভরপুর।

৪

শ্যাম মোর নয়ন-অঞ্জন,
সে মোর গলার হার,
সেই সে ভূষণ সার,
সেই মোর অম্বর চিকণ।
সেই ধর্ম্ম সেই কর্ম্ম,
সেই প্রেম সেই মর্ম্ম,
কুলশীল সবি মোর সে শ্যামরতন।

৫

কেন সই হইল এমন ?
কখনো ছিলনা দেখা,
সে আজ মরমে লেখা,
সেই আজ সরবস্ব ধন।
এ কেমন ব্যাধি ছাই,
ভাবিয়া তা নাহি পাই,
তোমরা কি জান সই এ রীতি কেমন ?

৬

হিয়ার জ্বলনী সখি মোর,
কি দিলে নিবিয়া যায়,
বল ধরি তুয়া পায়,
যাতনার নাহি যে লো ওর।
করিল কি হেন গুণ,
পরাণ হইল খুন,
কেবা লো কাটিল মোর মরমের ডোর !

৭

এদাসী বুঝেছে ভাল রাই,
প্রাণের কবাট হানি,
সরবস্ব নেছে টানি,
নটবর রসিক কানাই।
হিয়া দগদগী যত.
সো মিলনে হবে হত,
নতুবা ঔষধি তার ত্রিজগতে নাই।

বাঁশরী।

গিয়াছিনু ভরা সাঁঝে যমুনা বেলায়,—
শুনিনু মধুর বাঁশী কদম্ব-তলায়।
বাঁশীর ললিত তান,
মাতায়ে তুলিল প্রাণ,
প্রতি অঙ্গে হ'ল সখি অমিয়া সিঞ্চন।
হেন মাতানীয়া বাঁশী শুনিনি কখন।

বাঁশরীতে বহে সখি কি মলয় বায় ?
নিদাঘে হিমানী দিল ঢালিয়া হিয়ায় !
কে বাজায় হেন বাঁশী,
সাধ হই তার দাসী,
বাসনা হইল তায় দেখি একবার,—
খুঁজিলাম আতি পাতি তাই চারিধার।

দেখা না পাইয়া তায় পাগল কিশোরী,
অলক্ষ্যে পরাণে আজো বাজিছে বাঁশরী।
আমার শপথি তোয়,
করুণা করিয়া মোয়,
সে মোহন বংশীধারী দেখা একবার।
নতুবা এ দেহে প্রাণ রবে না আমার।

ভগন হইল হৃদি বাঁশরীর ঘায়,
জানিনা কি দোষে বাঁশী মজালে আমায় !
কার দূতী হ'য়ে ভাই,
আওল সে মোর ঠাঁই,
কি বোল বলিল কাণে চিত উচাটন।
বংশীধারী বিনা মেরা না রহে জীবন।

মজাইল যার বাঁশী অবলার মন,—
তার অধিকারী সে যে না জানি কেমন!
যার বাঁশী কুল ন্যাশে,
সে যদি নিকটে আসে,
সে যদি একটি বলে স্নেহের বচন,—
না জানি অবলা তবে হয় লো কেমন!

আমার এ চিতখানি নাহি মোর আর!
বাঁশরী করেছে তারে মরমের বার।
পরাণ নিয়ত কাঁদে,
হৃদয় না থেহ বাঁধে,
সে বিনা তিলেক দায় রাখিতে জীবন!
একবার আনি তায় করা লো দর্শন।

চাহিনা লো কুল শীল কায কি তাহায়,—
শ্যাম কলঙ্কেরি হার পরাও আমায়।
শ্যাম নামে জটা করি,
পিরীতি গৈরিক পরি,
যোগিনী হইয়া আজি করিব গমন,
সাধিব তপস্যা যাহে মিলে সে রতন।

এতই বলিতে ধনী হওল আকুল,
নয়নের জলে যায় ভাসিয়া দুকুল।
সখী কোলে ল'য়ে তায়,
কতই না সমুঝায়,
কে শুনে সে নীতি কথা প্রেম অগেয়ান।
উছাসে মরমখানি করে আনচান।

বিহ্বলা রাই।

কেন বা সাঁঝের বেলা,
করিতে সলিল খেলা,
গিয়াছিনু যমুনা বেলায়!
কি ক্ষেণে তথায় গেনু,
পাগল হইয়া এনু,
একি জ্বালা ঘটল আমায়!

আপনার মাথা খেয়ে,
কেন বা গেছিনু ধেয়ে,
ভরা সাঁঝে যমুনা বেলায়।
কি জানি সাঁঝের বেলা,
কোন্ দেও করে খেলা,
কার দিঠি লাগল আমায়।

বিনা সে কালিয়াধন,
যায় বুঝি এ জীবন,
কেমনে বা পাইব তাহায়!
রাজার কুমার কালা,
হাম আহিরিণী বালা,
সে কেন বা চাহিবে আমায়।

বামন হইয়া হেন,
শশী পেতে সাধ কেন,
লাজে মরি স্মরি নিজ-কাজ গো?
কে জানে বিহির সাধ,
জীবনে সাধল বাদ,
দূরভেল কুল শীল লাজ গো!

ধরি সখি তুয়া পায়,
এইবার করুণায়,
গরল আনিয়া দে লো মোরে,
গরল করিয়া পান,
জুড়াব তাপিত প্রাণ,
কহিনু মরম কথা তোরে।

এতই বলিয়া কাঁদে,
সঙরিয়া কালাচাঁদে,
সখী ভাবে মিলন উপায়।
কবে সে যুগল ধনে,
নেহারিবে একাসনে,
ভাবে সখী আকুল হিয়ায়।

সখীর প্রতি শ্রীমতী।

কি স্বর শুনিনু সখি কদম্বতলায় ?
ধরিতে না পারি চিত,
হিয়া মোর পিপাসিত,
সে স্বর পাগল যে লো করিল আমায়।
অলক্ষ্যে বাজিয়া বাঁশী,
পরাণে পরালে ফাঁসী,
শর নহে তবু হৃদি ভগ্ন সেই ঘায়।

ধীরে ধীরে সপ্তমেতে মিলিয়া পবনে,
কাঁপাইয়া চরাচর,
উঠিল যখন স্বর,
তড়িৎ বহিল মোর পরাণে সঘনে।
স্তব্ধ হ'য়ে চেয়ে থাকি,
স্তবধ গাছের পাখী,
স্তবধ বিশাল বিশ্ব দেখিনু নয়নে।

হেন স্বর এ জীবনে শুনি নাই আর।
শুনি সে মোহন স্বর,
হিয়া কাঁপে থর থর,
ধরম করম জাতি যায় বা রাধার।
ব্রজে বাঁশী বাজে হেন,
আগে না কহলি কেন,
তাহ'লে না হইতাম ঘর হ'তে বার।

এখন কি করি সখি প্রাণ রাখা ভার।
এখনো কাণের মাঝে,
সদা সে বাঁশরী বাজে,
হৃদয় মথিয়া বহে অমৃতের ধার।
কি ব্যাধি হওল মোর,
ভাবিয়া না পাই ওর,
অথবা পড়ল দিঠি কোন্ দেবতার!

বালা কহে শ্যাম-বাঁশী বিঁধল হিয়ায়।
সে যে বাঁশী কুলনাশা,
মরমে ক'রেছে বাসা,
আর কি ধৈরয ধরি ঘরে থাকা যায়।

যদি নিজ হিত চাও,
শ্যাম-পদে প্রাণ দাও,
বঁধুরে মিলিতে কর অবহুঁ উপায়।

শ্রীকৃষ্ণ ও সখী।

বল হে গোকুলচাঁদ,
অবলা বধিতে,
নিঠুর চিতেতে,
পাতিলে কেমন ফাঁদ?
কেন সাধ বাদ,
কিবা অপরাধ,
হওল তোমার পায়!
কেন বধ অবলায়?

যবহিঁ তো মনোহরা,
হেরল কিশোরী,
আপনা পাসরি,
মুরছি পড়ল ধরা।
মৃদু মৃদু যাস,
মুখে তুঁহু নাম,
যেন হে পাগল পারা,
আতঙ্কে হইনু সারা।

ক্ষণে কাঁদে ক্ষণে হাস,
ক্ষণেক নীরব,
দেখি যেন শব,
দূরে গেল নিশোয়াস।
উরধ নয়ন,
পাণ্ডুর বরণ ;
বিঁধিয়া কি হেন বাণ,
বধিছ ধনিকো জান ?

কিম্বা কহ ছাড়ি ছল,—
তব আঁখি-বাণ,
বিঁধেনি পরাণ,
বিয়াধি ক'রেছে বল।
কিন্তু ব্যাধি তার,
নিরূপিতে ভার,
(যদি) তুহুঁ নাম কাণে পশে,
তবহিঁ উঠিয়া বসে।

তাই হাম সাধি তোয়,—
চল মোর সনে,
নিকুঞ্জ কাননে,
যাঁহা সো পিয়ারী রোয়।
যদি ব্যাধি তার,
পার বুঝিবার,
করিও ঔষধি দান,
বাঁচাতে ধনীকো প্রাণ।

শুনিয়া সখিকো ভাষ,—
বঙ্কিম চাহিয়া,
কহিছে কালিয়া,
ঢালি মধুরিম হাস।
"পিরীতি বিকার,
ভেল রাধিকার,
অবহুঁ সারিতে পারে।
যদি পাই দেখিবারে।

কিন্তু তা' কেমনে হয়?
ধনী পরনারী,
মিলনে হামারি,
কেমনে ধরম রয়?
যদি বা যাইব,
কেমনে সহিব,
উপহাস ব্রজময়"।
বালা ভাবে চিতে,
সখী পরখিতে,
এত চতুরালী চয়।

সখীর উত্তর।

কিবা তু কহলি শ্যাম!
যেই তোর তরে,
নিতি ঝুরে মরে,
তাহারে হওলি বাম?
বাজাইয়া বেনু,
তুমি রাখ ধেনু,
সে যে হে রাজার বালা,
তবু তোর তরে,
নিতি হাহা করে,
দারুণ পিরীতি-জ্বালা!

শাখায় কোকিল ডাকে,
ভাবি তুয়া বাঁশী,
হইয়া উদাসী,
আনমনে চেয়ে থাকে।
যবে নবঘন,
করে গরজন,

তোমার নূপুর বলি,—
ইতি উতি চায়,
দেখিতে না পায়,
আবেশে পড়য় ঢলি।

পাগল হল বা ধনী,
চাহি নীলাকাশ,
ছাড়ে নিশোয়াস,
স্মরি তুয়া নীলমণি।
ডাকিলে না ভাষে,
কভু কাঁদে হাসে,
কি তাহে কবলি কালা ?—
নাহি বুঝি কেন,
তোর প্রেমে হেন,
ভেল মুগধিনী বালা।

নিতি ঢালে আঁখি লোর,
সে কনক কাঁতি,
ভেল হীন ভাতি,
পরিতো পিরীতি ডোর।

এত নিঠুরালী!
কেনবা দেখালি,
রমণী-ঘাতক মুখ!
রাজার নন্দিনী,
তুয়া কাঙালিনী,
স্মরিতে উপজে দুখ!

মরমে কাটলি সিঁধ,—
ভাবি নিরবধি,
কি দিব ঔষধি,
না খায় না যায় নিদ।
তুমি ত রাখাল,
রাখ ধেনুপাল,
কি জান পিরীতি-রীতি,
পরশ-রতন,
চিনে কি কখন,
অবোধ রাখাল জাতি!

মান ভরে এত বলি,
অবনত শিরে,
সখী ধীরে ধীরে,
রাই পাশে গেল চলি।
"পাইয়া রতন,
করি অযতন,
হারায়নু" ভাবি মনে,—
ত্বরিতে কানাই,
বিনোদিনী ঠাঁই,
ভেজয়ল দূতী-জনে।

তৃতীয় তরঙ্গ।

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ।
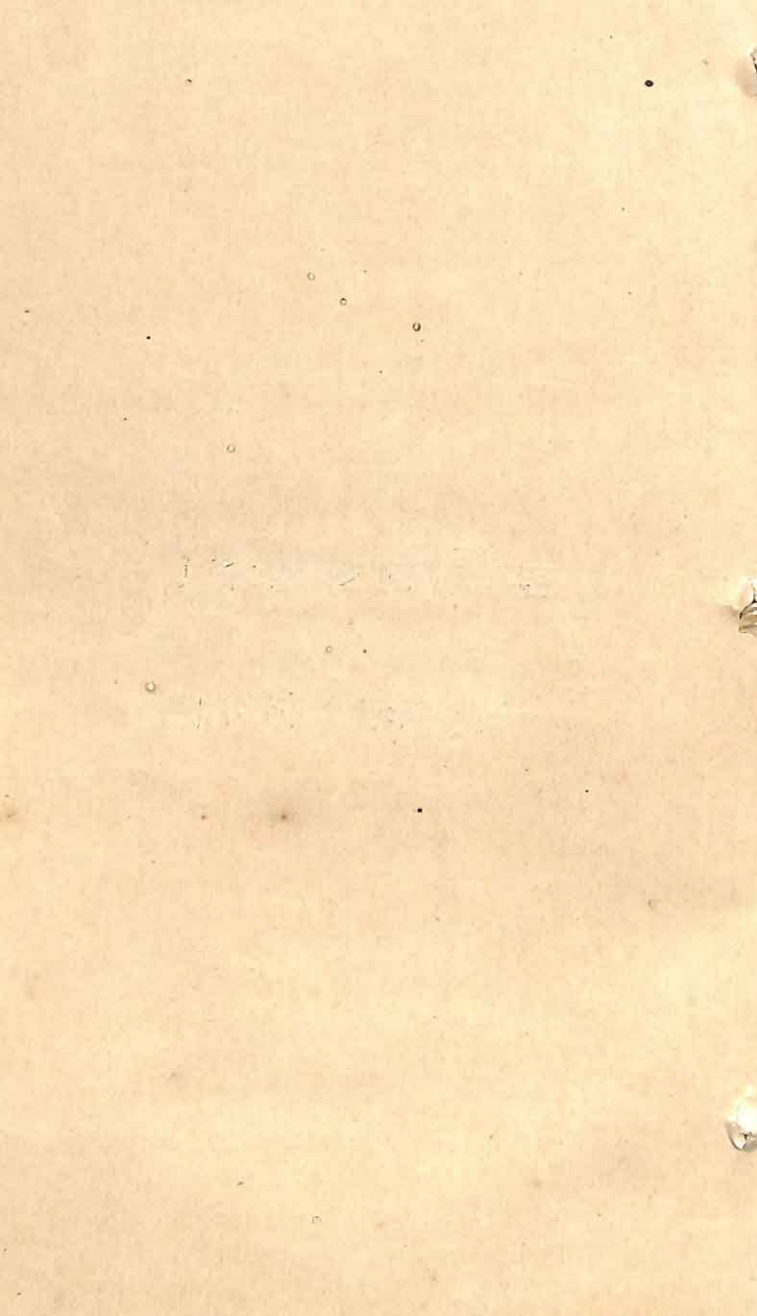
(সখার প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)

যমুনাকো তীরে সখে
পহিলে পেখনু রাই।
কিরূপ হেরিনু,
পাগল হইনু,
যেন দেখিলাম সখে
শত চাঁদ এক ঠাঁই।
অথবা বিজুরী,
হইয়া বাউরী,
পড়েছে ধূলায় লুটি।
অথবা উজল,
কনক কমল,
ধরায় রয়েছে ফুটি!
ষট্ পদ দল,
হইয়া বিভল,
মুখপদ্ম পাশে ধায়।
তুলনা মিলে না তায়!

হেরই আমারে ধনী
অম্বরে ঝাঁপল মুখ,—
ভরিয়া পরাণ,
না পারিনু পান—
করিতে দরশ সুধা ;—
মরমে বাড়ল দুখ।
প্রেম-শর ঘায়,
বিঁধিয়া আমায়,
দূরে স'রে গেছে চোর,—
হৃদয় আসনে,
একা নিরজনে,
বসেছে করিয়া জোর।
বিহি করুণায়,
কত দিনে হায়,
মিলায়ব হৃদিচোর।
(নতু) ছোড়ব জীবন মোর।

ধরিয়া কানুকো পাণি,
কহে যত সখাগণ,

শ্যাম সো পিয়ারী,
রাজার ঝিয়ারি,
তারে পেতে সাধ ছি ছি!
ছোড় এ নিলাজ মন।

কি বল কানাই,
লাজে ম'রে যাই,
পিরীতে হইলে ভোরা,
কহিতে যে দুখ,
বরজে এ মুখ,
কেমনে দেখাব মোরা!

দূরি লোক লাজ,
কহে রসরাজ,
"পিরীতি গরলে মোর—
জ্বলইত দেহা,
নাহি পাই থেহা,
বিনা সো হৃদয় চোর।

মরম জ্বলিছে মোর
বিষম পিরীতি ঘায়,—

পিরীতি দহনে,
না দহে যে জনে,
এ দারুণ ব্যথা মোর
সে নাহি বুঝিবে হায় ।

নাহি বুকে যার,
পিরীতি-পসার,—
সে বুঝে ধরম নীতি ।
পিরীতি যাহায়,
ক্ষিপ্ত করে হায়,
সে বুঝে কি ধর্ম্ম গীতি !

পিরীতি বিকার সখা
মরম জারল যার,—
তাহারে অশেষ,
ধর্ম্ম উপদেশ—
বিজনে রোদন সম,
বেশী কি বলিব আর ।

রাইকো মিলিতে,
উপায় ঝটিতে,

কর সখে করুণায়।
না পাইলে তায়,
গিয়া যমুনায়—
সঁপিব হে আপনায়।
দূতী কি বলল,
জ্বলনী বাড়ল,
জিউ না ধরণে যায়।

শ্রীমতী দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

সখে,
কে ও ধনী যায়,
নবীন নাগরী,
কাঁখেতে গাগরী,
থমকে থমকে চায়।
দেহের বরণ,
সে যে অতুলন,
বিজুরী শরম পায়।

কে ও ধনী যায় ?
আগে পাছে সখি,
যেন হেন লখি,
তারা ঘেরা শশী ভায়।
হাসির ছটায়,
পরাণ মাতায়,
কি মাধুরী মরি তায় !

কে ও ধনী যায় ?
ও কটাক্ষ শর,
করে জ্বর জ্বর,
মরম বিঁধিল ঘায় !
কেবা হেন বীর,
না হ'য়ে অথির,
ধৈরয ধরিবে তায়।

কে ও ধনী যায় ?
গতি মৃদুতর,
যিনি করিবর,

বেণীতে ভূজগ ভায়।
ভুরু কাম ধনু,
জ্বর জ্বর তনু,
কিসে হৃদি থেহ পায়।

মৃদু হাসি তায়,
এক সখা কয়,
ওহে রসময়,
কি কহ পাগল প্রায়।
(ও যে) রাজার নন্দিনী,
রাধা বিনোদিনী,
যমুনা সিনানে যায়।

শ্রীমতীর প্রতি—শ্রীকৃষ্ণের দূতী।

শুন শুন রসময়ি রাই!
নিঠুরা হইয়া হেন,
কানুকো বধিছ কেন,
তুয়া বিনা জিয়েনা কানাই।
সদা করে হায় হায়,
মনে না সোয়াথ পায়,
আকুল হইয়া সদা রোয়।
নাহি বসে লোকালয়,
সদা নিরজনে রয়,
ভাল তাহে নাহি লাগে কোয়।

কভু বা চাহত নীলাকাশে,—
কভু নখে লিখে ধরা,
কভু বা গেয়ান হরা;
সখাগণ ডাকিলে না ভাষে।
কভু ধড়া চুড়া খুলি,
ধয়ায় পড়ত ঢুলি,

গোঠ মাঝে আর নাহি যায়।
কভু "রাধা রাধা" বলে,
বুক ভাসে আঁখি জলে,
সাধিলেও কিছু নাহি খায়।

ধনি! কিবা করিলি তাহায়?
মোহন বেশেতে তার,
যতন নাহিক আর,
স্বর্ণ অঙ্গ ভূমে গড়ি যায়।
কি ক্ষেণে দেখালি মুখ,
ভেদিলি কোমল বুক,
ঘন ঘন ছাড়ে নিশোয়াস!
হৃদি তার ভেঙে চুরে,
এখন রহিলি দূরে,
বাঁচিবে না হেন বিশোয়াস।

ব্রজে আছে আরো কত ধনী,—
ভুলেও না নাম করে,
সদা ঝুরে তুঁহু তরে,
তুই তারে নিঠুরা এমনি!

শুনিয়া দূতিকো ভাষ,
মরমে বাড়ল আশ,
লাজে মুখে বাক না সরই।
নীরব হইয়া ধনী,
স্মরে কানু গুণমণি,
মিলনের বাসনা স্বতই।

বালা কহে ত্যজ ধনি লাজ,
ঝুরে শ্যাম রসময়,
বিলম্ব উচিত নয়,
বঁধুয়ারে ব্যথিয়া কি কাজ।
ব'স দুঁহে একাসনে,
হেরি বালা দুনয়নে,
জনম সফল করু আজ।

—

মিলন।

শ্যাম বিনা রাধিকার কাতর পরাণ,—
হেরি তাহা দ্রুত সখি করল পয়ান।
শ্যামপদে গিয়া বলে শুন শুন কান।
তুয়া বিনা ধনী বুঝি ত্যজয়ে পরাণ।
রাইক ঐছন দশা করিয়া শ্রবণ,
সখী সহ কুঞ্জে কানু করিল গমন।
নাগর দরশে ধনী হইলা বিভল।
শিহরি উঠিল অঙ্গ ভাবে ঢল ঢল।
বঁধুয়া সঙ্গহি আশা বুকে উথলায়,
তবুও শরমে ধনী দূরে যেতে চায়,—
সে ছবি বর্ণিতে ভবে কে পারে ভাষায়!
হেরে সে মাধুরী বালা বিভল হিয়ায়।

চতুর্থ তরঙ্গ।
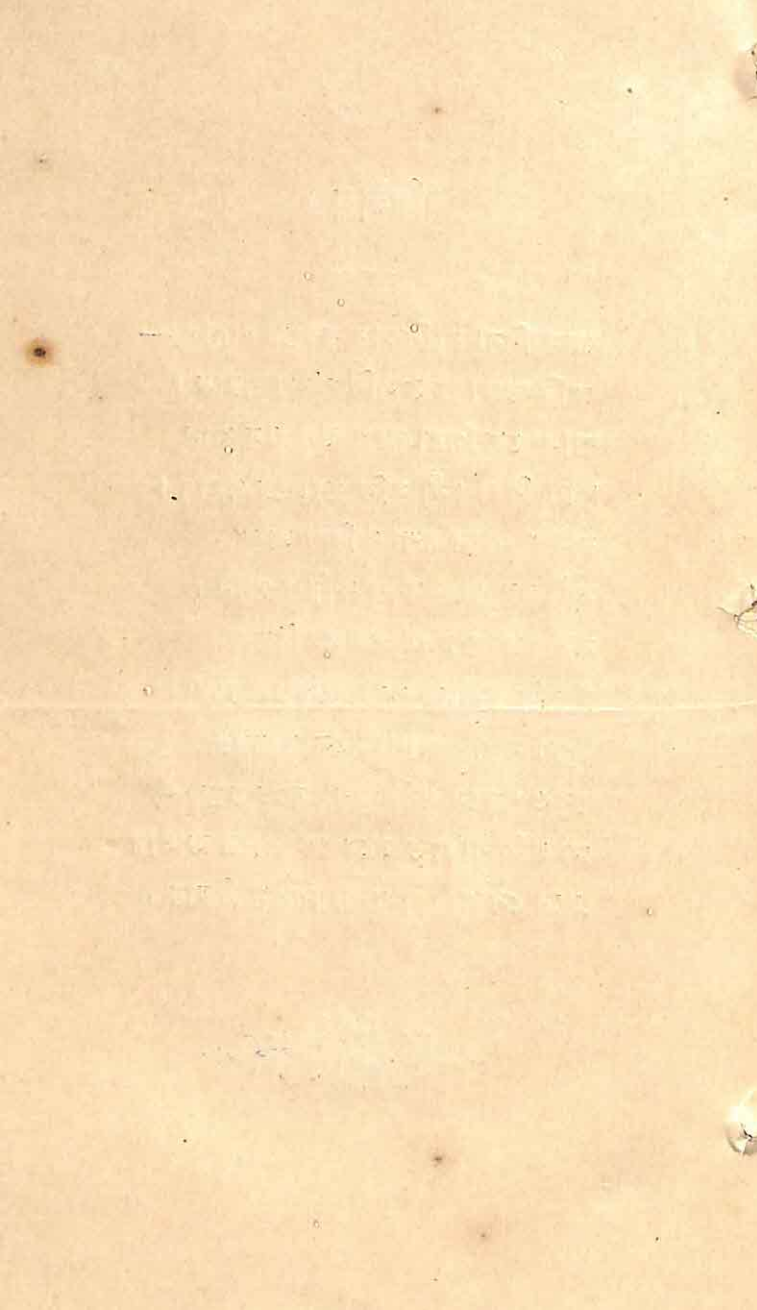
দানলীলা।
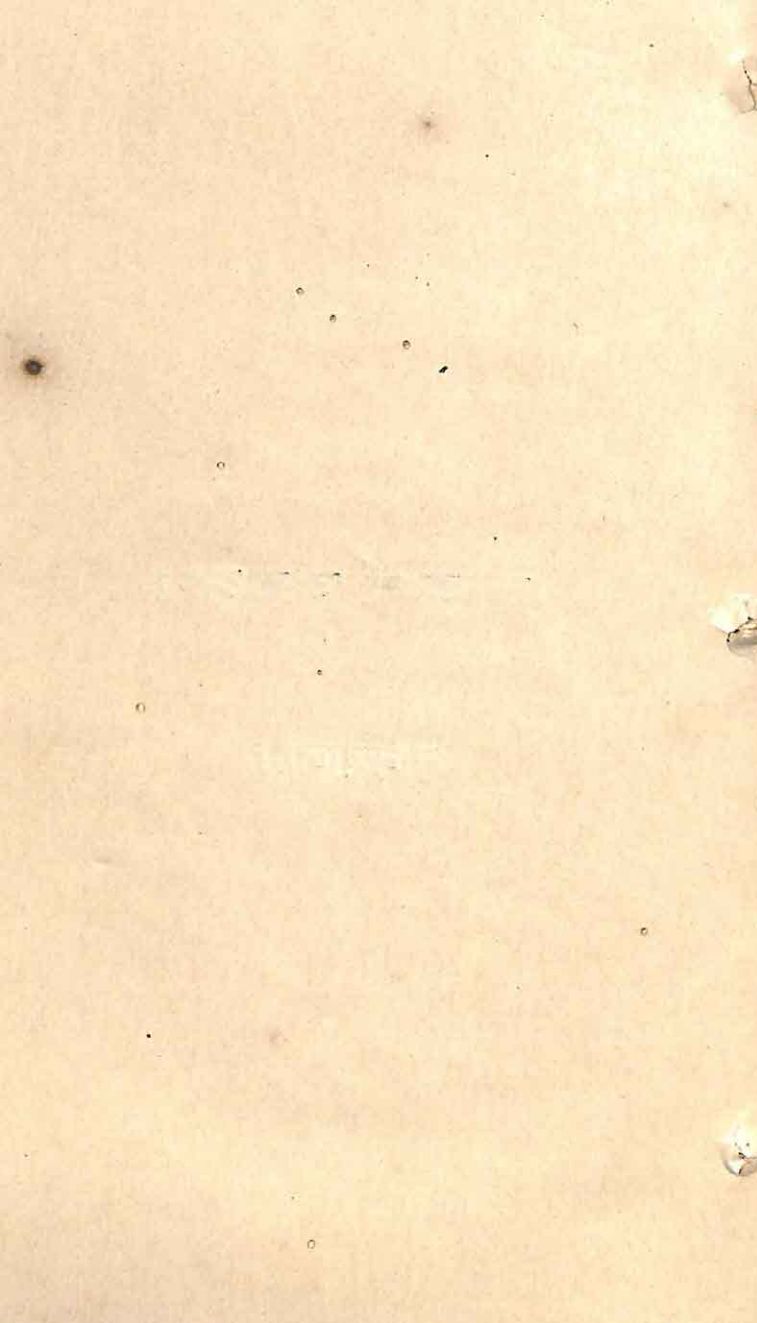
রাজপথে।

সখিসহ কমলিনী—
আপন আলয়ে যায়,—
মুরলী বাজায়ে কালা
হেন কালে দান চায়।

বলে আমি ব্রজে দানী
হেথা দান সাধি নিতি,
ফাঁকি দিয়া যেতে চাও
এবা লো কেমন রীতি!

এত বলি শ্রীমতীর
অঞ্চল ধরিল টানি,
অন্তরে বিভলা রাই
প্রেমরসে পাগলিনী।

হৃদয়ের অন্তরালে
আনন্দ উছাস বয়,
লোকলাজে নত-ধনী
কপট কোপেতে কয়—

সখিলো কালিয়া কেন
পরশ করিল মোয় ?
দান সাধে দান দিব
পর নারী কেন ছোঁয় !

কেনবা অঞ্চল সখি
ধরল করিয়া জোর ?
পরশিল পরনারী
ধরম টুটল মোর।

প্রভাতে উঠিনু আজি
দেখি বা কাহার মুখ,—
জানিনা কেন যে বিহি
দিল বা এতই দুখ !

এ লাজ রাখিতে মোর
জগতে নাহিক ঠাঁই,—
তোরা ঘরে যা লো, আমি—
যমুনা পশিতে যাই।

যমুনায় আত্মডালি
করি অরপণ আজ,—
ঘুচাব মরম সখি
জীবনের যত লাজ।

এতই শুনিয়া তবে
মাধব আকুল হাসি,
আবার মধুরে কয়
বাজায়ে মোহন বাঁশী।

কি বলিলে বল শুনি—
লো মাধব মনোহরা,—
কোন লাজে কহ মোরে
রমণী ধরম চোরা।

আমি ত রাখাল জাতি
সদা ধেনু সনে ছুটি,—
মরমে কাটিয়া সিঁদ—
কারোনা পরাণ লুটি ।

তুমিত রমণী ধনী
সদা ধরমেতে রতি,—
ঘাতুকের পথে কেন
নিতি হেন গতাগতি ।

কোন দোষে নন্দসুতে
পাগল করিয়া দেহ,—
কোন দোষে বধ তায়
আমিত না পাই থেহ ।

এ কোন ধরম নীতি
বুঝিয়া তা উঠা দায়,—
নরহত্যা অপরাধ—
হিয়া কি কাঁপেনা তায় ।

মাধব আচার হেরি,—
রসময়ি সখি কয়,—
দূর কর রসিকতা
মরমে নাহিক ভয়।

কেমন বুকের ছাতি
পরশ ধনীকো অঙ্গ,—
পাবে ভাল প্রতিফল
দূর হবে রস রঙ্গ।

আমরা পসরা ল'য়ে
নিতি হেথা আসি যাই,
এপথে জীবনে দানী
আমরাত দেখি নাই।

নন্দের দুলাল ব'লে
এতই বেড়েছে বুক,
কোন ভাগ্যে দেখিবেহে
রাধিকার চাঁদ মুখ?

বামন হইয়া বল
চাঁদ কে ধরিতে পায়,—
সুরভোগ্য সুধারাশি
অসুরে কি লভে হায়!

শুন হে মাধব সখা!
যদি নিজ হিত চাও,—
অঞ্চল ছাড়িয়া ত্বরা
ধীরে নিজ গেহে যাও!

কানু কহে বিনা দানে
কভু না ছাড়িব রাধা
ভাবিছে সঙ্গিনী দল
ভাল বটে দান সাধা!

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীবৃন্দ।

ঢাকিল ঊষার ছবি,
উদিল তপত রবি,
উত্তাপে জগত চমকায়,—
রাজপথে রাই সনে,
দাঁড়াইয়া সখীগণে,
দানী হটে যাইতে না পায়।
তপত রবির করে,
কম-কায়ে ঘর্ম্ম ঝরে,
গোপীদল কহে কালিয়ায়—

তপ্তরবি দেয় জ্বালা,
আমরা সরলা বালা,
মরি যে হে ভুক পিয়াসায়।
আমরা অবলা বালা,
তুমিত পড়সী কালা,

এত দুখ দিতে না যুয়ায়।
শাশুড়ী ননদী ঘরে,
বিলম্ব দেখিলে পরে,
বজর বা হানিবে মাথায়।

গাঁথি ভাল বন মালা,
কালি তোরে দিব কালা,
আজি দান দিতে কিছু নাই,—
আজি সবে ক্ষমা চাই,
ক্ষমা কর ঘরে যাই,
হাসি কন রসিক কানাই—
"ভাল ক্ষমিলাম সবে,
এক দান দিয়া তবে,
ঘরে যাও আর কথা নাই"।

কহে যত গোপবালা,
কিবা দান চাহ কালা,
ঝাট কহ ঘরে ফিরে যাই।
কানু কহে "বেশী নয়,
মিটে যায় সমুদয়,

একটি কটাক্ষ দিলে রাই"।
লাজে নত গোপীদল,
বুকে প্রেম ঢল ঢল,
তবু কহে করিয়া বড়াই—

আমরা আহিরীবালা,
লইয়া পসরা ডালা,
নিতি ঘুরি সারা ব্রজময়,—
অঞ্চল ধরিয়া কাছে,
কেহই না প্রেম যাচে,
এ দারুণ কেহই না কয়।
ক্ষমিলাম তুমি ব'লে,
দেখাতাম অন্য হ'লে,
গোপী-বুকে কি শোণিত বয়।

বালা কহে গোপিকার,
ক্ষমা বিনা কিবা আর
শকতি বা কালিয়ার আগে।
মুখের বড়াই যত,
মরযে আপনা হত,

চিত ভরা নব অনুরাগে।
বালার পরাণ কবে,
শ্যাম অনুরাগী হবে,
কবে ঠাঁই পাবে দাসী ভাগে।

সখীর প্রতি শ্রীমতী।

ঐ পথে কেন বা সখি
আনিলি আমারে হায়
পথে আছে মহাদানী
সে যে নিতি দান চায়।

খুলেদিই অঙ্গ ভূষা
তাহে নাহি উঠে মন,—
সে যে সখি দান সাধে
নারীর যৌবন ধন।

আমি জানি আন পথে
ল'য়ে যাবি মথুরায়,—
কেজানে যে দানী-করে
সঁপে দিবি লো আমায়!

ঘরে ননদীর জ্বালা
পথে জ্বালা এ দানীর,—
এ অবলা কুলনারী
কেমনে হইবে থির!

না পাইলে দান লবে
পসরা কাড়িয়া রাগে,—
তাহ'লে দেখাব মুখ
কেমনে ননদী-আগে!

কেন বা করিলি সখি
আমারে ঘরের বার?
এ দানীর হাতে আজ
কেমনে পাইব পার!

দানী যে চতুর বড়
অরাহিঁ নয়ন হানি,—
লুটে লবে অবলার—
এ ক্ষুদ্র পরাণখানি।

কথা নহে আঠাজাল
ধরে তাহে প্রাণপাখী।
হাসিতে লুটিবে সই
যা কিছু রহিবে বাকী।

ওইলো আসিছে দানী
পসারি যুগল কর।
কাঁপিছে বালার হৃদি
প্রেমাবেগে থরথর।

শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণ।

উদিল কনক রবি,
কিবা সে মধুর ছবি,
মাতাইল এ সারা ভুবন।
অলি ফুলে মধু লুটে,
সমীর বেড়ায় ছুটে,
পঞ্চমে গাহিছে পিকগণ।

সরসে কমল দল,
প্রেম রসে ঢলঢল,
রবিকর করিছে চুম্বন,—
নাবিক তরণী ল'য়ে,
সারী গেয়ে যায় ব'য়ে,
গোঠে যায় গোপ সুতগণ।

কুলের বহুড়ী, গুলি,
আধেক্ ঘোমটা তুলি,
ধীরে ধীরে ফিরে ফিরে চায়,—
"উঙা উঙা মা মা" রবে,
উঠিছে বালক সবে,
যার বুকে স্নেহ উথলায়।

হেরি সে মধুর দৃশ্য,
বিমোহিত সারাবিশ্ব,
হেনকালে বৃকভানু বালা,—
লইয়া সঙ্গিনীকুল,
কাননে তুলিতে ফুল,
চলেছেন ল'য়ে সাজিডালা।

রসিকা গোপীকা যত,
নিজ নিজ মনোমত,
তুলিছেন নানা জাতি ফুল।
হেন কালে শ্যাম-বাঁশী,
ছড়াইল সুধারাশি,—
গোপীদলে করিয়া আকুল।

বিভল হইয়া চায়,
বাঁশী না দেখিতে পায়,
উছাসে পড়িল সবে বসি,
বড় মাতানীয়া সুর,
ভরম করল চুর,
ধৈরয বাঁধন গেল খসি।

এ চাহে উহার পানে,
হেন কালে সেইখানে,
উদিত হইলা কালাচাঁদ।
হেরিতে সে চারুমুখ,
মরি মরি কতসুখ,
(রূপ নহে নারী মারা ফাঁদ !)

মোহন মুরলীস্বর,
গোপীর মরম ঘর,
করিয়াছে ভাঙি শত চুর,
ছিল যে গেয়ানটুক,
দরশে ও চারু মুখ,
সেটুকুও হইল গো দূর !

সে রসিক চুড়ামণি,
কহেন শুনলো ধনি,
কেন ফুল তুল বার বার !
আপন কানন যেন,
নিষেধ মান না কেন,
বল দেখি এ কোন্ আচার ?

চির কাল তুল ফুল,
কিছুই না দেহ মূল,
আমি হেথা দানী চিরদিন।
ফাঁকি দাও অনিবার,
আজি না পারিবে আর,
ফিরে দাও যত বাকী ঋণ।

সম্বরি অঙ্গের বাস,
ঢালিয়া মধুর হাস,
শ্যামচাঁদে কহে গোপীকুল,—
তুমি কবে হ'লে দানী,
আমরাত নাহি জানি,
মোরা হেথা নিতি তুলি ফুল।

যত ফুল বৃন্দাবনে,
সবি তুলে গোপীগণে,
কেহ কভু নাহি চাহে দান।
কিবা দান গোপীঠাঁই,
পণ্য দ্রব্য কিছু নাই,
ফুলে দান এ কোন্ বিধান!

লতাস্নিগ্ধ ছায়ে বসি,
কহিছেন কাল শশী,
"নবরাজ্যে এ নব বিধান।
আমার বিমল ফুল,
জগতে মিলেনা তুল,
চাহি তার উপযুক্ত দান।"

হাসি ভাষে গোপীকুল,
এসেছি তুলিতে ফুল,
দান দিতে নাহি কোন ধন।
কহেন রসিকবর,
"ওই মুখ শশধর,
নীলপদ্ম যুগল নয়ন—

আছে যে প্রণয় বুকে,
মৃদু হাসিটুকু মুখে,
তাই দান দেহ লো আমায়”।
এতবলি শ্রীমতীর,
চরণে লুটায় শির,
মরি মরি কি মাধুরী তায়!

হেরি তা গোপীকাদল,
রোষে ভেল বিচঞ্চল,
কহে কানু কি তুহুঁ আচার?
না হয় তুলেছি ফুল,
তাব'লে নাশিবে কুল,
ধর্ম্মভয় নাহি কি তোমার!

তুলিনু কুসুম দল,
দিলে ভাল প্রতিফল,
এবার ছিঁড়িব লতাচয়,—
যত দুখ দিলি তাই,
কহিব রাজার ঠাঁই,
তোরে কালা মোদের কি ভয়!

অন্তরে প্রণয়-স্রোত,
হইতেছে ওতোপ্রোত,
কানু সহ রসিকতা আশে,—
রসিকা গোপীকা খালি,
খেলে এত চতুরালী,
রোষ নহে প্রেমাবেগে ভাসে।

প্রেমে আঁখি ঢুলু ঢুল,
তুলেছিল যত ফুল,
নিছনী করিল কালিয়ায়,—
তবু রোষ শান্ত নয়,
ছিঁড়িতে লতিকাচয়,
সখীগণ উপবনে ধায়।

হেরি তবে নিরালায়,
রাই কহে বঁধুয়ায়,
"ছিছি একি কর রসরায়!
সখির সমুখে হেন,
নিলাজ কর বা কেন,
লাজে চিত ধরই না যায়।

আমিত তোমারি দাসী,
তব প্রেম নীরে ভাসি,
তব ছবি মরমে অঙ্কন।
ঘরে থাকি ব্যস্ত কাজে,
বাঁশী সদা কানে বাজে,
ছুটে আসি হেরিতে বদন।

তা ব'লে কি এত লাজ,
দিতে হয় রসরাজ,
কি বলিবে ছি ছি সখীগণ,"
মাধব মধুর হাসে,
বাঁধল দু'ভুজ পাশে
চাঁদে চাঁদে ভেলকি মিলন!

পেয়ে মন মত দান,
বিদায় মাগিল কান,
সখী-সহ ধনী গেহে যায়।
শ্যাম-প্রেমে জ্বর জ্বর,
চিত কাঁপে থরথর,
বালা ভেল অবশ তাহায়।

শ্রীকৃষ্ণ ও সখী।

কে তুমি মথুরা যাও কে যায় তোমার সনে?
কুলের বহুড়ী কার,
করিয়া কুলের বার,
অনুমানি লুকাইতে যাহ দূর নিরজনে।
এপথে আমার ভার,
কেমনে পাইবে পার,—
বিনা পরিচয়ে কভু না ছাড়িব দুইজনে।

কুলের বহুড়ি ল'য়ে যাবে তুমি নিরালায়,—
হেথায় পাতিয়া থানা,
সাধি রাজ-কাজ নানা,
ভাল মন্দ হ'লে কিছু আমিসে ঠেকিব দায়।
নীরবে দুজনে হেন,
পলায়ে যা'ছিলে কেন,
রাজ-দান ফাঁকি দিবে এই বুঝি চিত চায়!

হেথা আমি নিতি নিতি দান সাধিলো রাজার !
তোমার সখীর গায়,
নানা আভরণ ভায়,
বিনা দানে কেমনে বা হইবে যমুনা পার।
তাহাতে যুবতী জন,
এর দান লক্ষ পণ,
প্রতি অঙ্গে লব দান বাকি না পড়িবে তার।

"প্রতি অঙ্গে দান" শুনি সখী কহে মৃদু হাসি,—
সঙ্গে বিনোদিনী রাই,
পসরা বিকাতে যাই,
তুমি বা দিয়াছ হানা কেন হে এ পথে আসি।
তুমিত নন্দের ছেলে,
দান সাধা কবে পেলে,
কুলবতী-কুলে কেন ঢাল হে কালিমারাশি।

মাঠেতে পাতিয়া থানা তথা কর গোচারণ,—
কদম্ব তলায় আসি,
বাজায়ে মোহন বাঁশী,

যুবতী-অঞ্চল ধরি সাধহে যৌবন ধন।
এ পথে আসিয়া কান!
আভরণে চাহ দান,
প্রতি অঙ্গে দান সাধ—রাজারে কি দিবে ধন?

তব তরে অবলার কুলশীল রাখা দায়,—
যথায় যুবতী নারী,
তথা তুমি বংশীধারী,
দিঠিতে ভুলিয়া নারী যৌবন সাধয়ে পায়।
কেন মিছা হঠ দানী,
আমি তোরে ভাল জানি,
নাহি দিব দান, কর যা তব পরাণ চায়।

তোমার এ দান সাধা কহিব রাজার আগে,
ভাল মন্দ নাহি জানি,
কেমন তোমার দানী,
রাজপথে যুবতীর কুলশীল দান মাগে।
যে তোরে না জানে কান,
তার কাছে চাহ দান,
আমরা ভুলিনা তোর রাঙা আঁখি নব রাগে।

কর যদি বাড়াবাড়ি পাবে প্রতিফল তার!
ভাঙি বাঁশী বনমালী,
যমুনায় দিব ডালি,
যার তানে রমণীর কুলশীল থাকা ভার।
ধড়াচুড়া দিব খুলি,
অঙ্গেতে মাখাব ধুলি,
শরমে না হও যেন ঘরের বাহির আর।

এতই শুনিয়া কানু হাসিয়া সখীরে কয়,—
আমি রাজ-দান সাধি,
তাহে হ'তে চাও বাদী,
রাজ সনে এত হঠ কভু ধনি ভাল নয়।
হেথা বাঁধা রাখি রাধা,
তুমি যাও নাহি বাধা,
বিনাদানে কার সাধ্য মোর ঠাঁই রাই লয়!

এত বলি চলে কানু ধরিতে শ্রীমতী কর।
ভয়ে ধনী কুঞ্জ পাশে,
ছুটল উরধ শ্বাসে,
কোমল হৃদয় খানি কাঁপিতেছে থর থর।

বাজায়ে মোহন বাঁশী,
রাই-প্রেম—অভিলাষী
ছুটিলা পশ্চাতে কানু মিলিতে নিকুঞ্জঘর।

সখীর প্রতি শ্রীমতী।

সখি মোরে ত্বরা ধর ধর!
ওইলো নবীন দানী,
বিঁধিল মরমখানি,
ও তীক্ষ্ণ নয়ন-শরে পড়ি বুঝি ধরা'পর।

সখি মোর না চলে চরণ,—
পাগল হইনু দেখে,
কুল শীল দিনু ডেকে,
আকুল মরম মাগে শ্যাম-অঙ্গ পরশন।

আর না যাইব ফিরে ঘরে,—
মনকথা তোরে কই,
চন্দন হইয়া সই,
বড় সাধ মিশে রব ও পূত হৃদয়োপরে।

অঞ্চল ধরিয়া সাধে দান,—
কিবা দান দিবি তোরা
অমিত আবেশে ভোরা,
বালা কহে দান দেহ রাঙাপদে মনপ্রাণ।

পঞ্চম তরঙ্গ।

নৌকাবিলাস।
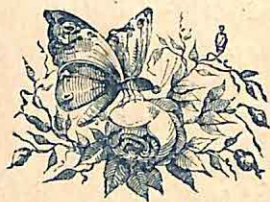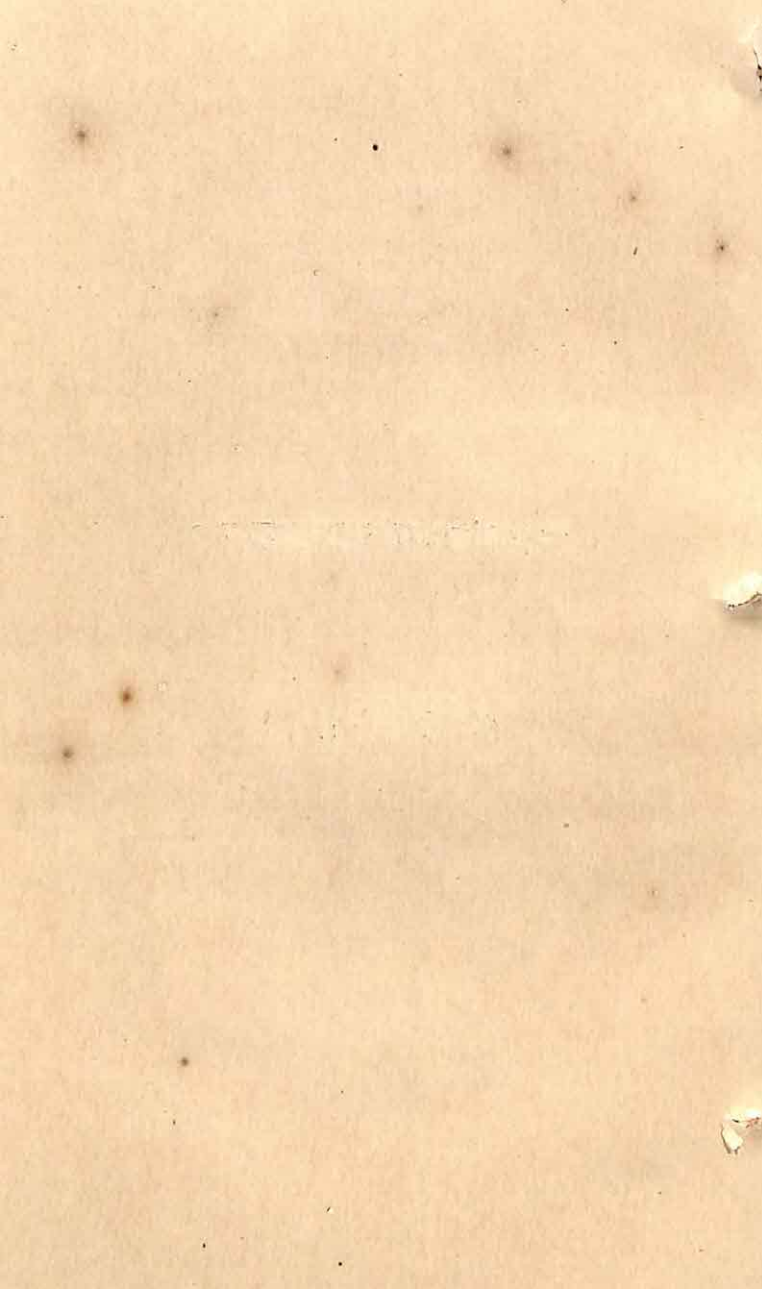
তরি আরোহনে।

তীরেতে তরণী নাই আকুলিত গোপীগণ।
হেনকালে এক জীর্ণ তরী পেয়ে দরশন,—
ডাকিছে গোপীকা তায়,
"রে নাবিক ত্বরা আয়
বহিয়া যাইছে বেলা যাইব পসরা ল'য়ে!
তরি নাহি পাইলাম ঘুরিতেছি শ্রান্ত হ'য়ে।

মূল দিব ত্বরা করি পার কর মোসবায়"।
নাবিক তরণী আনি উঠাইল গোপীকায়।
কহে নেয়ে গোপীকায়,
"আমার এ জীর্ণ নায়,—
একেবারে কভু সখি সহিবেনা এত ভার।
এস সবে একে একে ক'রেদি' যমুনা পার!"

শুনি কহে গোপীদল কি উপায় হবে তবে ?
সময় বহিয়া যায় পসরা বিকাব কবে ?
কহিছে নাবিক বর,
"তবে ফিরে যাও ঘর,
জীর্ণ তরিমাঝে মোর চাপাইয়া এত ভার—
যমুনায় ডালি দিব পরাণ কি সবাকার !

অথবা তোমরা সখি যাও সবে এক নায়,—
আমি পার করে দিই কোলে ক'রে রাধিকায় !"
শুনি তাহা গোপীচয়,
রুষিয়া নাবিকে কয়,
"ওরে নেয়ে এত বল কেবা শুনি দিল তোরে ?
নায়ের নফর চাও পিয়ারী লইতে কোরে !

না হয় যাবনা আজি পসরা লইয়া আর,—
তা'বলে কি তোর করে জাতি যাবে অবলার !
থাক্ তোর তরি ঘাটে,
মোরা যাই অন্য বাটে,
নাহি কি মোদের গতি তোর তরি বিনা আর" !
বসন ধরিয়া নেয়ে কহে তবে গোপীকার—

"বৃথা কেন কর রোষ মোর তরি বিনা আর—
কভু না পারিবে হ'তে এ দুরন্ত নদী পার।
শুনলো শপথি তোর,
প্রতি ঘাটে তরি মোর,
লক্ষ লক্ষ জনে নিতি করিতেছে নদী পার।
মোর তরি বিনা সখি কারো গতি নাহি আর।

তাই বলি মিছা কেন বাড়াও বিবাদ আর,—
বিলম্বে কি ফল এস ক'রেদি' যমুনা পার।
তোদের ও রূপরাশি,
আমারে পরালে ফাঁসি,
তোদের না করি যদি আজি এ যমুনা পার—
অকুলে আমার নায় কে তবে চড়িবে আর"!

নাবিক-বচন শুনি বাহুড়িল গোপীদল,—
বহিঠল তরি মাঝে প্রেমে চিত ঢল ঢল।
মাধব হাইল ধরি,
কমলিনী তরি'পরি,
বালার লাগিল ধাঁধা হেরি এ মাধুরীচয়।
বালা কবে হৃদয়েতে বাঁধিবে ও পদদ্বয়।

তরণীতে।

জলদে ছাওল নভো
বরষে মুষল ধার—
কৈছনে হওব সখি
আজি এ যমুনা পার!

ভীষণ বায়ুর বেগ
অশনির কড়স্বর,—
ভিগল অম্বর শীতে
তনু কাঁপে থর থর।

তটেতে তরণী নাই
তরণীতে নাই মাঝি,
ননদী বা কি কহব
এখানে রহিলে আজি।

এতই কহিয়া রাই
সখি-মুখপানে চায়,
সখীরা কহিছে "ধনি
ঘটল বিষম দায়"।

হেনকালে ধীরে ধীরে
তথা এক তরি যায়,—
নাবিক ডাকিছে "কে গো
পর পারে যাবি আয়"!

গোপীকা কহিছে "নেয়ে
ভিড়াও তরণী তীরে,—
ল'য়ে চল পর পারে
এই যত আভিরীরে।

পসরা বিকাতে মোরা
গিয়াছিনু মথুরায়,—
প'ড়ে আছি তটোপরে
দারুণ বিহির দায়!"

নাবিক ভিড়ায় তরি
উঠিল গোপীকাদল,
জীর্ণ তরি মাঝে উঠে
ঝলকে ঝলকে জল।

গোপীকা সিঞ্চই নীর
প্রাণভয়ে থরথর,
ফুটল হেমাব্জ যেন
সেই জীর্ণ তরীপর।

কভু বা নীলাব্জ আসি
আবরে হেমাব্জকুল,—
মরি মরি কি মাধুরি
জগতে মিলে না তুল।

তীর হ'তে তরিখানি
লইয়া অগাধ জলে,—
হাইল ছাড়িয়া দিয়া
নাবিক গোপীরে বলে।

হের মোর জীর্ণ তরি
বড় প্রতিকূল বায়—
ইষ্টদেব স্মর সবে
তরি বা অকূলে যায়!

আতঙ্কে কম্পিত গোপী
নাবিকে পাড়িছে গাল।
"কেমন কাণ্ডারী দিলে
তুফানে ছাড়িয়া হাল?"

নাবিক আকুল হাসি
চাহিয়া গোপীকা-মুখ,
মাগিল নায়ের মূল
গোপীর পিরীতিটুক।

শুনি তা' আতঙ্কে কাঁপি
উঠিল গোপীকাকুল
কহে "নেয়ে তোর কাযে
মরমে বিঁধল শূল।

আজ যদি ভালে ভালে
যমুনা তরিতে পারি,
কহিব রাজার আগে
ঘুচাব নাবিকজারি।”

নেয়ে হাসি শ্রীমতীরে
হৃদয়ে ধরল চাপি,
অঝোরে ঝুরিছে গোপী
বদনে অম্বর ঝাঁপি।

নীরবে সখীরে চাহি
হাসি বিনোদিনী কয়,
“নাবিক নন্দের ছেলে
কেন এত কর ভয়।”

চাহে তবে গোপীবৃন্দ
নাবিকের মুখপানে—
দেখিলা কানাই বটে
মোহিলা নয়ন-বাণে!

তখন আনন্দে সবে
সম্বরিল কেশ পাশ,
দূরে গেল ভয় ডর
মরমে উদিল হাস।

গোপীদল কহে "কানু
ভাল বটে মাতোয়াল!
নাবিক হইয়া কবে
শিখিলে ধরিতে হাল?"

ভীষণ তুফানে কেহ
আর না ফিরিয়া চায়,—
কি ভয় তাদের যারা,—
শ্যামের শীতল ছায়!

———

তরণীতে।

১

গোপীদল,
বিচঞ্চল,
তটেতে তরণী নাই,
তাহে ঘন,
গরজন,
রোয় সবে সেই ঠাঁই।

২

ভয়ে প্রাণ,
আনচান,
হেনই সময়ে শ্যাম,
তরি ল'য়ে,
মাঝি হ'য়ে,
উতারিল সেই ঠাম।

৩

বলে—"চড় নায়,
সবাকায়,
পর পারে লব হাম।"
ভয় টুটে,
সবে উঠে,
সঙরিয়া শ্যাম-নাম।

৪

নবনেয়ে,
যায় বেয়ে,
তুলিয়া প্রেমের পাল;
তরি মাঝে,
কিবা রাজে,
গোপীকা-রূপের জাল!

৫

গোপী কয়,
"রসময়,
ত্বরায় বাহিয়া চল,

হের মেঘ,
বায়ুবেগ,
তুফানে কি হবে বল !

৬

হে নাবিক,
ধিকি ধিক,
চলিছে তরণীখানি,
এত ধীরে,
গেলে তীরে,
কবে যাবে নাহি জানি।

৭

তরি জীর্ণ,
পাছে দীর্ণ,
হয় হে সমীর ঘায়,—
ভাল করি,
হাল ধরি,
সাবধানে ব'স নায়।

৮

তোর নায়,
চড়ি হায়,
বুঝি থাকি যমুনায়,—
এ তুফানে,
কোন্ প্রাণে
দিলি হা'ল ছেড়ে হায়!

৯

স্রোত যায়,
হায় হায়,
বুঝি ডুবে যায় তরি!
হিংস্র-দল,
করে বল,
বুঝিবা খাইবে ধরি!

১০

চিরকাল,
ধেনুপাল,
রাখিয়া জীবন ভোর,

হে রাখাল,
নায়ে হাল,
ধরিতে কি সাধ্য তোর !

১১

মান সাধা,
প্রেমে কাঁদা,
তোমারে তা' ভাল সাজে,—
এ আবার,
কি আচার,
মেয়ে হ'লে কোন্ লাজে !"

১২

তবে কয়,
রসময়,
হাসিয়া সখির ঠাঁই,—
"এত ঠাট,
এত নাট,
সকলেরি মূল রাই ।

১৩

এত করি,
ঘুরে মরি,
তবুও না পাই মন,—
নাহি চায়,
ফিরে হায়,
রমণী পাষাণ জন"।

১৪

গোপী কয়,
প্রাণময়,
কি আর রেখেছ বাকী,
প্রাণ নেছ,
মন নেছ,
কুলশীল দেছ ফাঁকি!

১৫

তবু হেন,
কহ কেন,
আর কিবা আছে সাধ?

নটবর,
অতপর;
আর কি সাধিবে বাদ।”

১৬

তরি'পর,
মনোহর,
এ মিলন অতুলন,
হেরি বালা,
ভুলে জ্বালা,
তিরপিত প্রাণ মন।

তরীমাঝে গোপীবৃন্দ।

ওহে রসরাজ, একি হেরি আজ, কুলশীল লাজ,
বুঝি বা সকলি যায়!
ভীষণ তুফান, যায় বুঝি প্রাণ, কিসে পাই ত্রাণ,
সলিল উঠিছে নায়!

মধুর হাসিয়া, কহিছে কালিয়া, দেখ লো চাহিয়া,
জীর্ণ মোর তরিখানি,
তোমা সবাকার, অত অলঙ্কার, ওড়নার ভার,
সবেকি তা' নাহি জানি!

যদি হিত চাও, মোর মাথা খাও, যমুনায় দাও—
ফেলে অঙ্গ-আভরণ।
ওড়নার ভার, কিবা ফল আর, শপথ আমার,
দূর কর আবরণ।

বিলম্বে কি ফল, যমুনার জল, ল'য়ে সখীদল,
ধোও অঙ্গ-মলাচয়।
কহি তো সবায়, এমন উপায়, কর লো ত্বরায়,
যাহে—তরণী না ভারি হয়।

মুছ আঁখি-জল, মিলি সখিদল, তরণীর জল,
ত্বরায় যতনে ডার।
প্রতিকূল বায়, চিত ভয় পায়, তবে মোর নায়,
যাবে সুখে পর পার!

নাবিক-বচন, শুনিয়া তখন, করিয়া যতন—
আতঙ্কে গোপীকাগণ,—
মুছি আঁখিনীর, নায়ে সেঁচে নীর, হইয়া অথির,
ফেলে দিল আভরণ।

হাসিতে হাসিতে, নবীন ভঙ্গিতে, নাবিক তীরেতে
উতারিল গোপীকায়।
কবে এ অবলা, ধুয়ে চিত্ত-মলা, ভুলে দ্বেষ-ছলা—
পাবে ঠাঁই ওহি পায়!

তরিতে শ্রীমতির উক্তি।

সখিলো চড়লি নায়ে কার?
গলে দোলে বনমালা,
রূপেতে জগত আলা,
অবলার কুল থাকা ভার!
নেয়ের মধুর হাসি,
পরাণে পরালে ফাঁসি,

বঙ্কিম চাহনি হেরি তার--
প্রাণের আগার টুটে,
মনটি বাহিরে ছুটে,
এমন নাবিক সখি কে কবে দেখেছে আর ?

জর জর করিল আমায় !
কেমনে যাইব ঘরে,
যাইতে না চিত সরে,
অবহুঁ কি করব উপায় !
আমার হৃদয় প্রাণ
সকলি করিনু দান,
নারিকের দুটি রাঙ্গা পায়।
কভুনা শ্রবণ করি,
নেয়ে লয় প্রাণ হরি,
নায়ের নাবিকে কেবা প্রেম সাধি দিতে চায় !

সখি ব্রজে বাঁশী কালিয়ার,--
পরায়ে পিরীতি ডোর,
লুটেছে পরাণ মোর,
পুন সই এ কোন্ আচার ?

নায়ের নাবিক হেন,
পরাণ লুটিছে কেন
দ্বিচারিণী প্রাণ কি আমার ?
কেন এনু নায়ে ওর,
টুটল ধরম মোর,
হায় হায় কিবা গতি হবে সখি রাধিকার !

ছিছি সখি লাজে প্রাণ যায়,—
নাবিকে স্থাপিয়া বুকে,
জীব আর কোন্ সুখে,
কি বলিব শ্যাম বঁধুয়ায় !
শ্যাম সে আমার সার,
শ্যাম বিনা সব ছার,
আজ একি ঘটিল লো দায় !
সখীরা কহিছে পায়,
এই সেই রস রায়,
যার ধন সেই নিল তোমার কি এসে যায় !

যুগল ।

সকল সঙ্গিনী মিলি
উঠিয়া ত্বরিতে
পসরা বিকাতে চলে
তরিয়া সরিতে ।

নাহি ননদীর জ্বালা
শাশুড়ীর ভয়,—
পরাণ খুলিয়া সবে
কত কথা কয় ।

বাখানে শ্যামেরে কেহ
কেহ বা বাঁশরী
প্রেমাবেশে নীরবেতে
শুনিছে কিশোরী ।

হেনকালে ধীরে নেয়ে
শ্রীমতীরে চায়
সে চারি নয়নে কিবা
প্রেম উথলায়!

উভয়ে উভয়ে হেরে
ঢুলই নয়ান,
হেরি সে মিলন ছটা
ধন্য মোর প্রাণ।

ষষ্ঠ তরঙ্গ।

অভিসার ।

চল সখি ত্বরিত গমনে,
তুয়া আসা-আশাকরি,
কত আশা বুকে ধরি,
আছে শ্যাম নিকুঞ্জ-কাননে ।
কোকিলেতে কুহু গায়,
তুয়া কণ্ঠ ভাবিতায়,
শুনে বঁধু আকুল শ্রবণে ।
মৃদুল সমীর ভরে,
গাছের পাতাটি ঝরে,
তুয়া পদধ্বনি ভাবি হায় !
নীরবেতে ইতি উতি চায় ।

না করসি বিড়ম্বন আর,—
পলে পলে তুয়া শ্যাম,
কাল গণে অবিরাম,
শঙ্কাপূর্ণ হৃদয় আগার ।

নিরাশ হওত কভু,
আমার আশায় তবু,
নিকুঞ্জেতে করে ঘর বার।
কভু ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস,
কভু চাহে নীলাকাশ,—
হেরইতে রজনীর গতি।
তাই সাধি চল দ্রুত অতি।

চাঁদনী নিশিথে পিক গায়,—
ভাবি তাহে নিশাশেষ,
সখি তুয়া হৃদয়েশ,
নিরাশায় ধরণী লুটায়।
আমার বচন ধর,
ত্বরা বেশ-ভূষা কর,
গিয়া দ্রুত ভেট বঁধুয়ায়।
মদন পীড়িত হরি,
যাও রাধে ত্বরা করি,
প্রেমালাপে তুষ গিয়া তায়।
বিলম্ব না সাজে লো তোমায়।

তবে রাই প্রিয় সখি সনে,
চলিলা বঁধুয়া পাশে,
বুকে প্রেম-স্রোত ভাসে,
সে মাধুরী বর্ণিব কেমনে!
যে পথে চলিবে রাই,
সখীগণ দ্রুত ধাই,
বৃন্ত ছিঁড়ি কুসুম যতনে—
বিছাওল পথি মাঝে,
পাছে কুশাঙ্কুর বাজে ;
তাহে ঢালে সুরভী চন্দন,
তঁহি মাঝে আরোপি চরণ—

চলে রাই বঁধুয়া মিলনে।
সে প্রেম স্মরণ করি,
প্রেমে কে না ডুবে মরি,
কেনা ডুবে যুগলচরণে!
সখীরা তাম্বুল ল'য়ে,
কুঙ্কুম চন্দন ব'য়ে,
চলে সুখে চন্দ্রাননী সনে।

মরমে ও যুগমূর্ত্তি,
সদা যার হয় স্ফূর্ত্তি
নরজন্ম সার্থক তাহার
হেন ভাগ্য হবে কি বালার!

সপ্তম তরঙ্গ।

বাসক-সজ্জা।

সখীজনে কহে রাই,
আজু সখি মোর, নাহি সুখ ওর,
ভেটয়ব রসিক কানাই।

সাজা সবে কুঞ্জবন,
গাঁথ ফুল-মালা, সাজাওব কালা,
আজি সখি মনের মতন !

সাজাও মঙ্গলডালা,
দ্বারের নিকট, রাখ পূর্ণঘট,
বরণ করিয়া লব কালা।

রাখ সুবাসিত জল,—
করিয়া যতন, ধোব সে চরণ,
কেশেতে মুছাব পদতল।

কর ফুলের বিতান!
ল'য়ে শ্রান্ত হিয়া, আসিছে রসিয়া,
তঁহি মাঝে করাব শয়ান।

বাটা ভরি রাখ পান,—
করিয়া যতন, রাখলো চন্দন,
মিলব লো তাহা ল'য়ে কান।

কি করিবে ধনজন,
কুলশীল-দলে, শ্যাম-পদতলে,
দিয়া আজি জুড়াব জীবন।

সব শঙ্কা পরিহরি,
সাজাও বাসর, আসিছে নাগর;
থুব তাহে হৃদয় উপরি।

রাই ভাষে সখীগণ,—
করিয়া যতন, মনের মতন,
সাজাওল নিকুঞ্জ-কানন।

জ্বালিয়া সুগন্ধ বাতি,—
লইয়া সজনী, আন মনে ধনী,
ঘর বার করে সারারাতি।

গাছের পাতাটি নড়ে,
মরমে গণিছে, বঁধুয়া আসিছে,
আবেশে ধরায় ঢলি পড়ে।

ধনীকো নবীন সঙ্গ,
নবীন নাগরী, রসের গাগরী,
খেলে বুকে রভস তরঙ্গ।

কানু-আশে মুগ্ধ বালা,
ইতি উতি ছুটে, চমকিয়া উঠে,
সখীরা আনিতে যায় কালা।

———

বাসকসজ্জা।

যতন করিয়া সখীগণ,—
সাজাওল বিনোদিনী,
বাঁধল মোহন বেণী,
ভুলে যাহে রসরাজ মন।
ললাটে সিন্দূর বিন্দু,
জিনিয়া শারদ ইন্দু,
কামধনু নয়নে অঞ্জন।

পরাইল অম্বর চিকণ,—
গলে ফুল-মালা দোলে,
হেরি তা' জগত ভোলে,
ভুলে যায় মন্মথ মথন।
যাবক শোভিছে পায়,
নূপুর বাজিছে তায়,
চাঁদে চাঁদে মিলন যেমন।

খোঁপা মাঝে দিল চাঁপা ফুল,
করেতে কঙ্কণ বালা,
রূপেতে জগত আলা,
রমণীরো হেরি প্রাণাকুল।
সাজাইয়া মনোমত,
মিলিয়া সঙ্গিনী যত
কানু-আশে হইছে ব্যাকুল।

রাজার ঝিয়ারী নব বালা,
পালঙ্কে শুতিয়া রয়,
তঁবহি না নিদ হয়,
পিরীতির কি বিষম জ্বালা!
ত্যজিয়া পালঙ্করাজি,
নব কিশলয়ে আজি,
কোমল শরীরখানি ঢালা।

ধনী জরজর প্রেম-শরে,
কানুকো মিলন আশা,
মরমে করেছে বাসা,
নিদ নাহি আওতহিঁ ডরে।

সাজায়ে বাসর ঘর,
কাঁপে ধনী থর থর,
সখী মিলি ঘর বার করে।

অষ্টম তরঙ্গ ।

উৎকণ্ঠিতা।
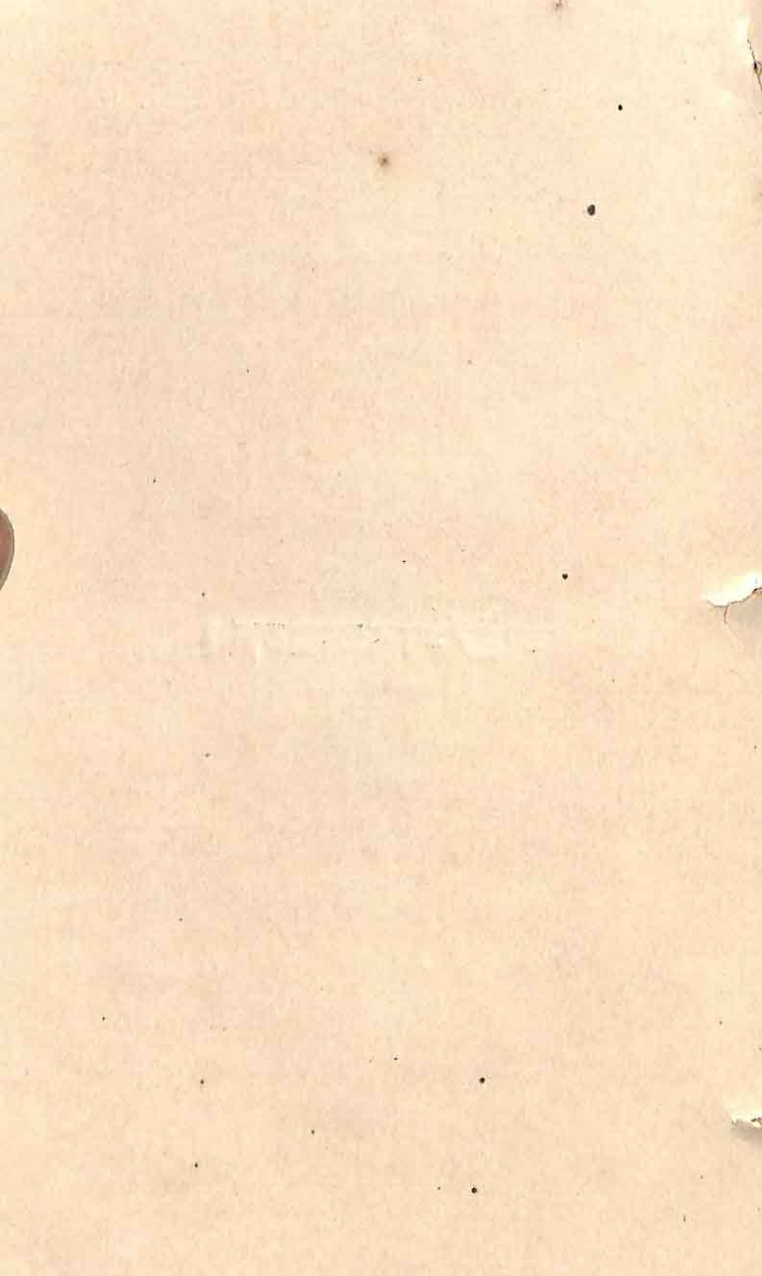
প্রাণ মোর কাঁদে সই,
"আসিব" বলিয়া,
বলেছে রসিয়া,
আশা-পথ চেয়ে রই।
বিনাইনু কেশ,
করিনু সুবেশ,
নাহি জানি শ্যাম বই !
কেমনে লো থির হই !
প্রাণ মোর কাঁদে সই,

কত অলিকুল,
করিয়া আকুল,
আনিলাম ফুল বালা,

শ্যামের গলায়,
দিবার আশায়,
গাঁথিনু মোহনমালা,
শ্যাম মোর এল কই।

প্রাণ মোর কাঁদে সই,
রমণীর মন,
করিয়া হরণ,
লুটিয়া পিরীতি ভার,—
ভুলে এক বার,
নাহি স্মরে আর,
এ দুখ কি ভুলিবার!
মরমে মরিয়া রই।

প্রাণ মোর কাঁদে সই,
ছিনু গেহবাসী,
করিল উদাসী,
তার সে বাঁশীর তান।

ঘরে থাকি হায়,
বাঁশী ডাকে "আয়",
ছুটে আসে পোড়া প্রাণ !
সাধে কি বাউরী হই।

প্রাণ মোর কাঁদে সই,
আমারে ফেলিয়া,
আমার কালিয়া,
রহল কুঞ্জেতে কার ?
কত রাধা হায়,
বাঁধা তার পায়,
মোর নাই সেই বই।

প্রাণ মোর কাঁদে সই,
বুঝি শ্যামে মোর
দিয়া প্রেম-ডোর
কেহ বা বাঁধিল হায় !

তাই প্রাণ ধন,
এলনা এখন,
ভুলে গেল রাধিকায়।
রজনী পোহায় ওই।

প্রাণ মোর কাঁদে সই,
মোর মাথা খাও,
ত্বরা করি যাও,
দেখে এস কোথা বঁধু।
মোর প্রেম-ডোর,
ছিঁড়ি মন চোর,
কোথা লুটে প্রেম-মধু
কার প্রেমে ভোর হই।

উৎকণ্ঠিতা।

ওই লো তমাল শাখে, কলকণ্ঠ কুহু ডাকে,
বুঝি নিশা পোহাইয়া যায়!
উদিয়াছে শুকতারা, পূবদিক মাতোয়ারা,
উজলিছে সোণালী ছটায়।
আমি যে শ্যামের আশে, রয়েছি নিকুঞ্জ-বাসে,
আমি যে লো শ্যাম-কাঙালিনী!
এলোনা বিনোদ কালা, বাড়িল বিরহ জ্বালা,
কেমনে বা জীবে অভাগিনী।
কি কব কহিতে লজ্জা, বৃথা এ বাসর সজ্জা,
গেল বঁধু ভুলিয়া রাধায়।
প্রেম-ডোরে বাঁধি হায়, কে তারে রাখিতে চায়
জ্বালি বহ্নি মোর এ হিয়ায়।
ধর সই ধর মোরে, প্রাণ যে কেমন করে,
দংশিতেছে বিরহ বিছায়।
অমি যে অবলা নারী, এত কি সহিতে পারি?
এনেদে লো গরল আমায়।

গরল করিয়া পান, ত্যজিব এ ছার প্রাণ,
চাহিনা লো শঠের প্রণয়!
না না কি হইবে তায়, পিরীতি বৃশ্চিক যায়
দংশিয়াছে ভেদিয়া হৃদয়,—
কি হবে মরণে তার, মরুক সে শতবার
তবহুঁ না যাবে সে জ্বলন।
মনকথা তোরে কই, এনেদে লো শ্যামে সই,
তবে যদি বাঁচে এ জীবন।

উৎকণ্ঠিতা।

সখি কেন নাহি এল কালবরণ?
সেই কালরূপে ভুলে,
কলঙ্ক দিলাম কুলে,
সে হইল নিঠুর এমন!
মিছা এ রূপের জাল,
যৌবন হইল কাল,
বঁধু বিনা বাঁচে কি জীবন!

সখি কেন নাহি এল কালবরণ?
যে জন সো বঁধু তরে,
রহে লো মরমে ম'রে,
শোভে তারে ছলনা এমন!
যে আগুন জ্বলে বুকে,
কহিতে সরে না মুখে,
দেখাবার নহে সে জ্বলন!

সখি কেন নাহি এল কালবরণ?
হৃদে মোর শেল হানি,
ভুলিল পিরীতিখানি,
না হেরিব আর সে বদন!
জানিনা করি কি গুণ,
পরাণ করিল খুন,
কার্য্য সাধি ভুলিল এখন।

সখি! কেন নাহি এল কালবরণ?
কি মোরে করিল কালা,
কি ভেল পরাণে জ্বালা,

কেন দহে মোরে সে এমন!
ছিল সুধামাখা মুখে,
কে জানে গরল বুকে,
বল সই কি করি এখন!

নবম তরঙ্গ।

খণ্ডিতা।
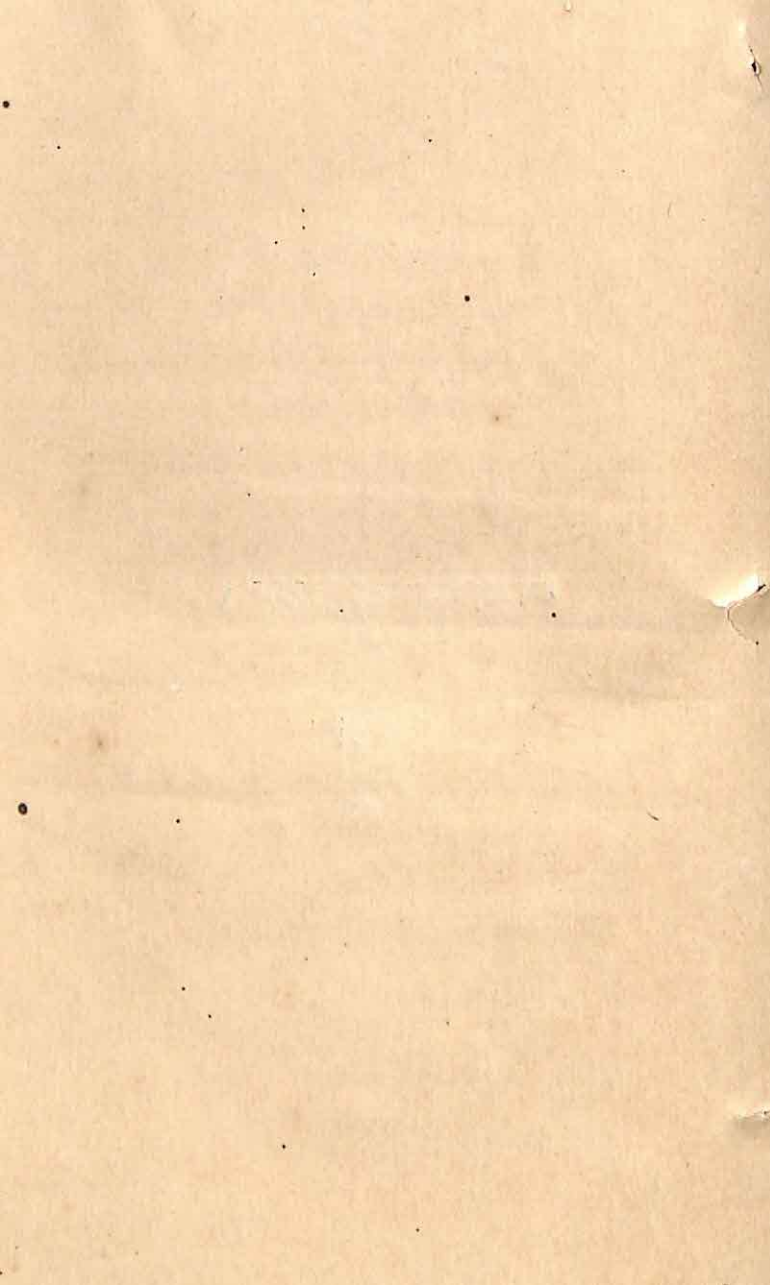
ভৎর্সনা ।

রজনী শেষেতে শ্যাম,
প্রবেশিলা কুঞ্জধাম,
রোষে তব্ না চাহল রাই ।
মানভরে নত বালা,
ছিঁড়িল কুসুম মালা,
তাম্বুলাদি ফেলিল ছড়াই ।
বঁধুয়া নীরবে ভাবে কি করি এখন
মানভরে বিনোদিনী কহিছে তখন ।

কোন্ ফুলে মধু খেয়ে,
প্রভাতে এসেছ ধেয়ে,
বাসী ফুলে কেন এ যতন !
একি হে বিনোদরায়,
ও বরাঙ্গে উথলায়
কেন হেন নিশা জাগরণ ?
কপালে সিন্দুর বিন্দু নয়নরঞ্জন
ধন্য সে সুন্দরী যেহে সাজালে এমন !

ও চারু অধর'পরে,
কে দিল সোহাগভরে,
তাম্বুলের দাগ হে এমন ?
কালতে লালের রেশ,
মিলেছে খুলেছে বেশ,
দর্পণেতে হের হে বদন।
এস এস ভাল ক'রে করি দরশন।
যে সাজালে হেন বটে রসিকা সেজন !

প্রভাতে দেখালে মুখ,
টুটিল সকল দুখ,
নিত্য হেন দিও দরশন !
দিন যাবে ভাল তবে,
কিছুনা জঞ্জাল রবে,
আর কিবা বলিব বচন !
রজনীতে ছিলে যথা দ্রুত তথা যাও।
এখানে দাঁড়ায়ে আর কেন ব্যথা পাও !

এত বলি মানভরে,
চাহে ধনী ধরা'পরে ;

করজোড়ে কহিছে কানাই—
"বৃথা ধনি কর রোষ,
নাহি মোর কোন দোষ,
শুনিবে কি কহিতে ডরাই!
আসিতে আঁধার রাতে নিকুঞ্জ ভবন,—
কণ্টকে অধর ক্ষত হ'য়েছে এমন!

নহে তাম্বুলের দাগ,
তুয়া প্রেম-অনুরাগ,
রঙিয়াছে আমার বদন।
তোমারি মিলন তরে,
গৌরী আরাধনা ক'রে,
পরিয়াছি প্রসাদি চন্দন।
রোষে তুমি সে চন্দনে দেখিছ সিন্দূর!
বিনা অপরাধে মোরে হ'য়োনা নিঠুর।"

এত বলি রসরায়,
চরণ ধরিতে যায়,
রোষে বালা দূরে ভই গল।

হেরিয়া বিষম মান,
আকুল বঁধুর প্রাণ,
বিষাদেতে ভূমে বইঠল।
কেমনে ভাঙিবে মান ভাবিছে উপায়।
বালা বলে তুয়া দোষে ঘটল এ দায়!

মানিনী।

গেহে ফিরে যাও শ্যাম হেথা আর কাজ নাই।
কেন আর নিশাশেষে,
দরশন দিলে এসে,
সে ধনী শুনিলে পাছে কুঞ্জেতে না দেয় ঠাঁই।

এখনো সময় আছে ত্বরা যাও তার পাশে।
আমরা আহিরী বালা,
গাঁথিয়া কুসুম-মালা,
সারারাতি ব'সে ছিনু বঁধুহে তোমারি আশে।

সে প্রেমের প্রতিদান ভালই করিলে বাঁকা !
সাধের নিকুঞ্জবাস,
ছাওল দীরঘ শ্বাস,
প্রভাতে এখন আর কেন মিছা মন রাখা !

তোমার ছলায় ভুলে দূরে গেল জাতিকুল,
আর না ভুলিতে চাই,
ত্বরা যাও তার ঠাঁই,
আজি আমাদের গেছে ভাঙিয়া সকল ভুল।

কেন শঠ দাঁড়াইয়া আমার কুঞ্জেতে আর ?
পরশি ও শঠ চিত্র,
কুঞ্জ হবে অপবিত্র,
তাই বলি দ্রুত হও আমার কুঞ্জের বার !

আমরা নিঠুর শঠে কভুনা পরশি হরি !
পর পুরুষের বায়,
যদি কভু লাগে গায়,
সিনিয়া যমুনা জলে আপনা পবিত্র করি।

অবলার কুঞ্জে তুমি কেন হে দাঁড়ায়ে আর ?
যাও পাছে দেখে কেহ,
চাহিনা শঠের লেহ,
না গেলে লইবে সখী ধরি রাজ-দরবার !

শ্রীমতীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণ।

কেন ধনি নিঠুরা এমন ?
এ চিত তোমারি কাছে,
চিরদিন বাঁধা আছে,
তোমা বিনা না হেরে নয়ন।
সখা সনে গোঠে যাই,
আনমনে সদা চাই,
যদি পাই তুয়া দরশন।

আমি দেহ তুমি লো জীবন,—
কেহ কি আপন প্রাণ,
দিতে পারে বলিদান,
কেমনে ভুলিব ও বদন !
এ ক্ষুদ্র পরাণখানি,
বাহিরে এনেছ টানি,
শূন্য করি হৃদয় ভুবন।

মাধব লো তুয়া ছাড়া নয়।
তোমারি ধেয়ানে মোর,
রজনী হইল ভোর,
তাই হেন ভেল অসময়,
সমাধি লভিয়া তোঁহে,
রজনী গোয়ানু মোহে
তবু তুহিঁ দাসেরে নিদয়।

শুন ধনি শপথি তোমার,—
তোমা বিনা অন্য জনে,
নাহি হেরি দুনয়নে,
তুহিঁ শুধু পরাণ আমার।

তবুও সন্দেহ ভার,
আমারি কপাল ছার,
বেশী তোরে কি বলিব আর !

রাখ ধনি মিনতি আমার ।
বিরহ দহনে প্রাণ,
করিতেছে আনচান্,
বাঁচাও লো বর্ষি প্রেমধার ।
নতু এ অনলে আর,
প্রাণ থাকা হবে ভার,
কানু নাহি জীবে লো তোমার ।

তবু ধনী নাথে একবার,
না চাহল তুলি আঁখি,
করেতে কপোল রাখি,
নিশোয়াস ত্যজে বার বার ।
কতই সাধল কান,
তবু না ভাঙল মান,
ভাসি তবে নয়ন ধারায়,—
কুঞ্জ তেয়াগিয়া বঁধু যায় ।

দশম তরঙ্গ।

মান।

কহিছে ললিতা শুন বিনোদিনি
কেমন পরাণ তোর,
কানু হেন নাহ উপেখা করিয়া
মানেতে রহলি ভোর !

সারা ব্রজনারী আপনা ভুলিয়া—
সদা লুটে যার পায়,—
সোবর নাগর রোই চলি গেও
ফিরে না চাহলি তায়।

তোর উপেখায় আকুল বঁধুয়া—
ত্যজে বা আপন প্রাণ !
কেমন পাষাণে বাঁধলি হৃদয়—
কভি না ছোড়লি মান।

এ গোকুলে বল তুয়া সম আর
কেবা আছে ভাগ্যবতী,
তুমি সে কানুর সরবস্ব ধন.
তুমি সে কানুর গতি।

তবহিঁ তুহার না মিটিল আশ
ক্ষুদ্র ছিদ্র নিরখিয়া,—
দারুণ মানের শরে লো পাষাণী
ভাঙলি তাহার হিয়া।

কুমুদি মুদিত হ'লে ভৃঙ্গবর
আনফুলে মধু খায়
তুই ত মানিনী উপেখলি তায়
তবহুঁ লুটাল পায়।

হেন গুণমণি নাহ তেয়াগিয়া
কেমনে ধরবি প্রাণ ?
সো বদন পানে ফিরে না চাহলি
এতই কি প্রিয় মান !

মান দূরে গেল ধনী আথে ব্যথে,
কহিছে সখীর ঠাঁই,—
"আপন দোষেতে রতন হারানু
এবে সখি কোথা যাই।

তুমি সে আমারে কহ হিতবাণী,
তাই সখি সাধি তোয়,
কহলো উপায় অবহিঁ কানাই
কেমনে মিলব মোয়!

যদি সো বঁধুরে নাহি পাই আর—
ত্যজিব এ ছার প্রাণ।
সখীরা বলিছে অব্ থির রহ
অবহুঁ মিলব কান।

—

সখীর প্রতি মানিনী রাই।

কহিছে রাধিকা শুনলো সখি,
এমন পিরীতি কভু না লখি।
আকাশে উঠায়ে ফেলিল তলে।
ডুবাল তরণী অগাধ জলে।
মুখে মধু হৃদে গরল তার,
এমন কবহুঁ না দেখি আর।
সঙরি সঙরি উহারি কথা,
পঞ্জরে আমার বিঁধিল ব্যথা!
কি ছার পিরীতি জারল দেহ,
না চাহি সজনি এমন লেহ।
কপটের সঙে পিরীতি করি,
থাকিতে লো আয়ু অকালে মরি।
চাহি না লো হেন পিরীতি ছার,
শ্যামর কাহিনী না বল আর।
সোনাম শ্রবণে পশয়ে যব্
হৃদি মাঝে আগি জ্বলয়ে তব্

তুঁহি সখি ভালি হওলি দূতি,
তোঁহারি কারণে মোর এ গতি।
এতই বলিয়া মানের ভরে,
বইঠল ধনী ধরণী'পরে।
সজনী তবহিঁ চরণ ধরি,
টুটায়ল মান যতন করি।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সখী।

শ্যাম পাশে গিয়া সখি
করে নিবেদন,
চল বঁধু ত্বরাগতি
নিকুঞ্জ কানন।

তুহিঁ যব্ কুঞ্জ হতে,
আওলি নিকালি,
তিতাওল ধরা রাই
আঁখি লোর ঢালি।

তুহাঁর নয়ন ধার
করিয়া স্মরণ,
বিষাদে কাতর ভেল
সব সখীগণ।

তুহাঁরি কারণ মোরা
করিয়া যতন,
কতই সাধিনু তার
ধরিয়া চরণ।

অব্ টুটয়ল মান
নাহি কোন ডর,
নিকুঞ্জে আসিয়া
তারে মিলহ সত্বর।

তব্ যদি রোখে ধনী
নেহারি তোমায়,
করজোড়ে নিজ দোষ
মানায়বি তায়।

ঢাকিবারে নিজ দোষ
যতহুঁ চাহবি,
বাড়িবে ততই মান
বেদনা পাওবি।

রাইক পরজা তুঁহি
সেহ ভেল রাজ
রাজপাশে অনুনয়ে
নাহি কোন লাজ।

তব কানু সখীসহ
করল গমন,
বসিয়াছে যথা ধনী
ল'য়ে সখীগণ—

তথা গিয়া ধীরে ধীরে
বইঠল কান,
হৃদয়ে লইতে চাহে
মনে জাগে মান।

"কি করি" নীরবে কানু
ভাবিছে তখন,
সখী কাণে কাণে বলে
"ধর শ্রীচরণ"।

চরণে সাধল বঁধু
দূরে গেল মান,
বালা সে মাধুরী হেরি
পাওলো পরাণ।

সখীর প্রতি শ্রীমতী।

সখি কোথা বঁধুয়া আমার,—
দারুণ মানের শর,
ভাঙিল মরম ঘর,
এবে বুঝি প্রাণ থাকা ভার!

সাধব চরণ ধরি,
কত না সাধল মরি,
কিবা ভেল কুমতি আমার।
মু'তুলে একটি কথা না কহিনু তায়,
পাষাণে বাঁধিয়া বুক খেদাইনু হায়।

বিদগধ মাধব আমার,—
হেরি নিঠুরতা মোর,
মুছই নয়ন লোর,
তবু মোরে সাধে—বার বার।
তবু হৃদি টলিল না,
এ পাষাণ গলিল না,
এ জীবনে কিবা কাজ আর।
মানভরে উপেখিয়া এবে ঝুরে মরি,
বঁধুয়া বিহনে কৈছে পরাণ বা ধরি।

তার সখি নাহি কোন দোষ,
কেমন পাষাণী হাম,
কাঁদি চলি গেল শ্যাম,
কোথা রাখি এই আপশোষ।

তোরাও যতন ক'রে,
কত সমুঝালি মোরে,
তবু মোর না টুটল রোষ।
যে বিনা তিলেক সখি না রহে পরাণ
ধিক নারীজাতি কেন করে তারে মান!

চাহি না লো এ তুচ্ছ পরাণ,—
যে দারুণ মান হায়,
উপেখল বঁধুয়ায়,
আজ তারে দিব বলিদান।
কানু তেয়াগল মোরে,
তবে লো কেমন ক'রে,
ব্রজমাঝে দেখাব বয়ান!
আজি যমুনায় সখি ডালি দিব প্রাণ,
কানুকো না করে যেন আর হেন মান।

এ জীবনে ঘটিল কি ভুল,
রসিক নাগর রায়,
তাহারে ঠেলিনু পায়,
এবে কেন পরাণ আকুল।

যে বর নাগর পায়,
সবাই বিকাতে চায়,
আহা মরি না লইয়া মূল !
জানি না কেমনে হায়,
নিঠুরা হইনু তায়,
কেন মানে ভরা হৃদিকূল ।
বিঁধিল মরম মাঝে সখি তীক্ষ্ণশূল,
এ জীবন বৃথা—গেল একুল ওকুল ।

শ্রীমতীর প্রতি সখী ।

এমন নিঠুর কথা
বল ধনী কেমনে ?
কেমনে বধিতে চাও
সো বঁধুয়া রতনে ?

তোমা বিনা নাহি স্মরে
সে যে দিবা নিশীথে,
তারে উপেখিয়া চাও
যমুনায় পশিতে!

দারুণ মানের দায়ে
তুমি প্রাণ ত্যজিবে,
তব সহচরী তবে
কেহ নাহি বাঁচিবে।

তোমা বিনা না বাঁচিবে
সেই বর নাগর,—
আমার বচন ধরি
ধর পদ তা কর।

অবহিঁ ক্ষমিয়া তুঁহে
কুঞ্জেতে সে আওব
অনন্ত বিরহ ব্যথা
সব দূরে যাওব।

সাধল চরণ ধরি
নাচাহলি ফিরিয়া,
সে যে কেঁদে ফিরে গেল
মরমেতে মরিয়া।

এখন কি হবে ধনি
বল আর কাঁদিয়া,
হারালে রতন কভু
নাহি আসে ফিরিয়া।

মিনতি করিয়া হাম
কত তুঁহে সাধলি,
কাঁদালে কাঁদিতে হয়
তখন না বুঝলি।

এখন কি হবে আর
যমুনায় পশিয়া,
আমরণ কর ধ্যান
নিরজনে বসিয়া।

যেমন করিলে কাজ
ফলভোগ তা কর,
তবে যদি করুণায়
চাহে বর নাগর ।

বালা কহে কত বল
নিঠুরালি করিয়া,
হাম আনি মিলায়ব
অবহিঁ গো কালিয়া ।

মিলন ।

কানু না পাইয়া রাই,
আকুল হইয়া, কতই কাঁদিয়া,
সাধিল সখীর ঠাঁই ।
বিরহ বিহনে, মধুর মিলনে,
রস নাহি উথলায়,
তাই সখীগণ, বঁধুয়া বচন,
না শুনিল উপেখায় ।

তারা ভাবে মনে, এ নব মিলনে,
উছসি উঠিবে ধরা,
তবে সে মিলন, হবে অতুলন
নহে বিড়ম্বনা করা।

রস আশে সখীগণ,
পরিখে নাগর, করি সমাদর,
পরিখে নাগরী মন।
সখীগণে রাই কহে "ত্বরা যাই
আন মোর বঁধুয়ায়।"
সখীগণ কয়, সে বড় নিদয়,
কুঞ্জে না আসিতে চায়।
সাধিলে তাহায়, গরবে না চায়,
বলে "কিবা দায় মোর,
আভিরীর পাশে, যাব কোন আশে,
নিশীথে হইয়া চোর"।

আবার মাধব যবে,
দেখাইতে রাধে, সখী ঠাঁই সাধে,
সখীগণ কহে তবে,—

কেন অনুরোধ, আর উপরোধ,
সে যে না মানিতে চায়,
সে বড় নিঠুর, প্রেম কৈল চূর,
মিলনে ঘটিল দায়।
প্রতিজ্ঞা তাহার, তুয়া মুখ আর,
না করিবে দরশন,
যদি ঘটনায়, কভু চোখে ভায়,
মুদিয়া সে দুনয়ন—

পশিবে হে যমুনায়।
তবে তোমাধনে, বলহে কেমনে,
লব তার কুঞ্জে হায়!
এতই শুনিয়া, আকুল হইয়া,
ভূতলে লুটায় শ্যাম,
খুলে গেল চূড়া, শিখি পাখা গুঁড়া,
অঙ্গেতে বহিল ঘাম।
নূপুর ছিঁড়িল, ধড়াটি খসিল,
নয়নে বহিল ধারা।
ধূলিমাখা কায়, কবে হায় হায়,
হইল সম্বিত হারা।

নেহারিতা সখীগণ,
হইল কাতর, চিত জ্বর জ্বর,
ভাবি সবে মনে মন,
বসি সেই ঠাম, শ্রীমতীর নাম,
শুনাইল কর্ণমূলে,
শুনি রাধা-নাম, উঠে বসে শ্যাম,
হৃদয় অবশে ঢুলে।
সখী মুখ চাই, কহিছে মাধাই,
"কেন দিলে জিউ দান!
এ জীবনে আর, কি ফল আমার
গেলে পর পাই ত্রাণ।

যদি কভু মোরে আর,—
করুণায় রাই, কুঞ্জ মাহ ঠাঁই,
নাহি দেয় একবার—
বাঁচিয়া কি ফল, মরণ মঙ্গল,
কেন না পরাণ যায়!
রাই হারা হ'য়ে, এ পরাণ ব'য়ে,
কি ফল হইবে হায়!

রাধাকুণ্ড মাঝ, প্রবেশিয়া আজ,
দিব জীউ বিসর্জ্জন।
মোরে দয়া করি, রাই-কর ধরি,
জানাইও এ বচন।

এত বলি নটবর,
রাধাকুণ্ড পাশে, ধায় উর্দ্ধশ্বাসে,
অরপিতে কলেবর।
হেরি সখীগণ, কাতরে তখন,
ধরিল মাধব-কর।
কহে সখীদল, হয়োনা চঞ্চল,
বল হে রসিকবর,
নারী মানে হায়, কবে কে কোথায়,
ত্যজিয়াছে কলেবর!
একান্তই আর যদি রহিবার,
নাহি পার নটবর,—

এস আমাদের সনে,—
কুঞ্জের বাহিরে, অতি ধীরে ধীরে,
দাঁড়াইবে নিরজনে—

বাহিরিলে রাই, অমনি কানাই,
চরণে ধরিও তার ।
দূরে যাবে মান, তুমি পাবে ত্রাণ
লভি প্রেম-পারাবার !
এত বলি তবে, শ্যামে ল'য়ে সবে,
চলিল নিকুঞ্জ মাঝ ।
সখীর কথায় মিলন আশায়
তাপ ত্যজে রসরাজ ।

দূরে রাখি শ্যামচাঁদে,
কুঞ্জেতে তখন, গেলা সখীগণ,
যেখানে রাধিকা কাঁদে ।
হেরি সখীগণে, কাতর বচনে,
কহিছেন বিনোদিনী,—
সত্যকি কানাই, না হেরিবে রাই,
নিঠুর কি সে এমনি !
রাধিকার কথা, রাধিকার ব্যথা,
পড়েনা মনেতে তার ?
পূরব কথন, শুধুকি স্বপন,
একি হৃদি কালিয়ার ?

এত সে নিঠুর হায়!
মোর মনকথা, মোর মনব্যথা,
সত্য কি ব'লেছ তায়!
কহে সখীদল, বলেছি সকল,
তবু না বুঝিল ব্যথা,
রাখাল সে হয়, কি বুঝে প্রণয়,
ছেড়ে দাও তার কথা।
শুনি সে বচন, রাধিকা তখন,
কহে শুন সহচরী।
হৃদয়ে যাহারে— বসায়েছি তারে—
ভুলিতে মরমে মরি।

আর না রাখিব প্রাণ,
শ্যাম নাম করি শ্যামকুণ্ড পরি,
দিব আজি আত্মদান।
করি মোরে স্নেহ, সেই মৃত দেহ,
রাখিও তমাল গায়,
দিনান্তে তথায়, আনি বঁধুয়ায়,
দিও মোরে তার বায়।

মৃত প্রাণ মোর, হবে সুখে ভোর—
সে বায় পরশ করি,
ওলো সখীগণ, এই নিবেদন,
রাখিস্ করেতে ধরি।

এত বলি বার বার,—
দ্রুতগতি হায়, কুণ্ড পাশে ধায়,
হইছে কুঞ্জের বার,—
হেনই সময়, শ্যাম রসময়,
চরণে পড়িল তার।
সে দৃশ্য হেরিয়া, বিভল হইয়া,
বিনোদিনী চমকিল,
বঁধুয়া তখন, করিয়া যতন,
পা দুখানি বুকে নিল।
বলে ক্ষম মোয়, শপথিলো তোয়,
বদনে চুম্বন দিল।

তখন ভাঙিল মান।
উভয়ে তখন, করে আলিঙ্গন,
অবশ যুগল প্রাণ।

করিয়া যতন, প্রেমে সখীগণ,
দুঁহে নিল কুঞ্জ মাঝে,
কুঞ্জের ভিতর, কিবা মনোহর,
যুগল রতন রাজে।
দুঁহার হৃদয়ে, কত তান লয়ে,
প্রেমে পাখোয়াজ বাজে।
গোপাঙ্গনাগণে, সেবিছে দুজনে,
ত্যজিয়া ধরম লাজে।

একাদশ তরঙ্গ ।
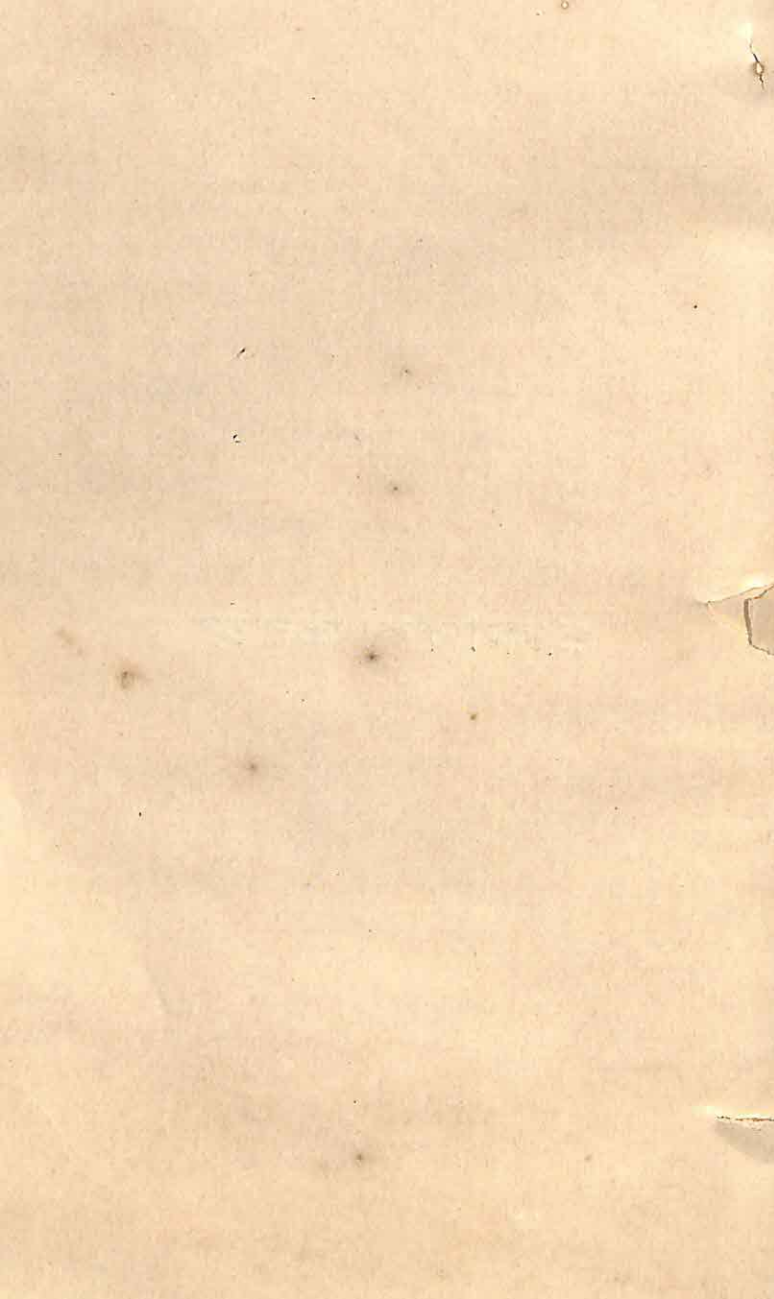
প্রেম-বৈচিত্র্য ।

হৃদয়ে হৃদয়ে ছুঁহে তনু তনু জোর,—
প্রেমালসে দুহুঁ চিত হওল বিভোর।
সখীগণে কহে ধনী,
কোথায় সে নীলমণি,
একবার দেখাওলো তার চারু মুখ ।
সে বিনা দহিছে সখি ! নিতি মোর বুক ।

পিপাসী চাতকী আমি সে যে নবঘন,
কেঁদে কেঁদে এত ডাকি না দেয় দর্শন ।
সে মোর নিঠুর নয়,—
তবু কেন হেন হয়,
মোর তরে সদা সখী সে যে লো পাগল ।
আমারি পিরীতি তার বুকে ঢল ঢল ।

আমারি হৃদয়ে রাখি তবু ভাবে দূরে,—
মোর নামে বঁধু তাই সদা বাঁশী ফুরে।
আমার দর্শন তরে,
সদা নানা ছল করে,
আমি সখী যেন তার জীবনের তারা।
তিল না দেখিলে পরে হয়লো সে সারা।

এমন পিরীতি সখি দেখি নাই আর।
এক মুখে কত কব গুণ বঁধুয়ার।
পেয়ে হেন বঁধুয়ায়,
হেলায় হারানু হায়,
সে বিনা তিলেক প্রাণ রাখিতে নারিব।
যমুনায় পশি আজ যাতনা নাশিব।

বলো তার দেখা পেলে ধরি শ্রীচরণ
"তোমার বিরহে রাই ছোড়িল জীবন"
এত বলি কাঁদে রাই,
সখী-মুখ পানে চাই,
ভালে করাঘাত করি করে হাহাকার।
শুধু মুখে বোল "কোথা বঁধুয়া আমার"

যার পদে সঁপিলাম জীবন যৌবন.—
অব্ কোথা গেলে তার মিলব দর্শন।
জীবনে মরণে সই,
সে বিনা কাহারো নই,
এই দেখ মোর হৃদি ভরা সে "ছটায়"।
এত বলি নখে হৃদি বিদারিতে চায়।

দ্রুত আসি সহচরী ধরি দুটি কর,—
কহে "ধনী হের ওই শ্যাম নটবর।
কেন ভাস আঁখি-জলে,
তুমি শ্যাম-হৃদিতলে,
উঠ আলিঙ্গিয়া তায় জুড়াও জীবন।
বঁধু-বুকে রহি কেন রোও লো এমন!"

তব্ ধনী ইতি উতি চারি পানে চায়,
হেরিল হৃদয়ে নিজ শ্যাম বঁধুয়ায়।
নাহিক সুখের ওর,
ঘুচিল বেদনা ঘোর,
উভয়ে উভয়ে হেরে বিভল হিয়ায়।
বালা কবে রত হবে যুগল সেবায়।

দ্বাদশ তরঙ্গ ।

বংশীশিক্ষা।

(১)

ধনি তুঁহে এ মিনতি মোর,—
একবার শ্যাম সাজি,
দাঁড়াও কুঞ্জেতে আজি,
আমি হই কমলিনী তোর।
ও চারু চিকণ চুলে,
চূড়া বাঁধ বেণী খুলে,
নীলসাড়ী করি বরজন,
পীত ধটি পর লো এখন।

দাঁড়াও ত্রিভঙ্গঠামে সখি,
চরণে নূপুর প'রে,
করেতে বাঁশরী ধ'রে,
আমি প্রাণভরিয়া নিরখি।

ভাসিয়া নয়ন জলে,
মোর বাঁশী"রাধা"বলে,
শুনি বাঁশী কি বলে তোমার !
পূরাও লো বাসনা আমার।

চারু করে বাঁশী ভাল সাজে,
পিয়ি ও অধর সুধা,
মিটুক বাঁশীর ক্ষুধা,
দেখি বাঁশী কি মোহনে বাজে।
আমি আজ তুমি হ'য়ে,
কাঁখেতে গাগরী ল'য়ে,
বারি আশে যাব যমুনায়।
ধীরে চাব কদম্ব তলায়।

তুমি ধনি নিতি মোর তরে,
কুল শীল লাজ ভয়,
তেয়াগিয়া সমুদয়,
ছুটে আস নবরাগ ভরে।

তাই আমি রাধা সাজি,
দেখিবারে চাহি আজি,
বহে তাহে কত সুধাধার।
পূরাও এ বাসনা আমার।

এত শুনি রসময়ি কয়,—
"কি বল মরি হে লাজে,
যার কাজ তারে সাজে,
নারী করে বাঁশী না শোভয়।
কুলের ললনা হায়,
পারিবনা হ'তে শ্যাম,
জানিনা হে আমি বাঁকা হ'তে,
তবে বাঁশী ধরিব কি মতে?"

—

বংশীশিক্ষা।

(২)

হাসিয়া বঁধুরে কহে শ্যাম নটবর
সাধি তোর শ্রীচরণে,
এ বড় বাসনা মনে,
তব করে হেরিবারে বাঁশী মনোহর।
ছাড় ছল মোর কীরে,
বাজাও বাঁশরী ধীরে,
দেখিব লো উঠে তাহে কি ললিত স্বর!

কহে তবে রাই শুন রসিক শেখর,
আমি তবে শ্যাম হ'য়ে,
দাঁড়াই বাঁশরী ল'য়ে,
শুন মোর বামে বসি মুরলীর স্বর।
পরি রাই পীত ধটী,
আঁটিয়া বাঁধিল কটি,
বেণী খুলি বাঁধে রাই চূড়া মনোহর।

পরিল ললাটে ধনী উজল চন্দন,
কঙ্কণ তেয়াগি বালা,
পরে তোড় তাড় বালা,
চরণে নূপুর সাজে নয়ন রঞ্জন।
নাগরের বেশ ধরি,
নাগরে নাগরি করি,
ত্রিভঙ্গিম ঠামে ধনী দাঁড়ায় তখন।

তবে রাই হাসি হাসি বাঁশরী ধরিয়া,—
বলে কোন্ রন্ধ্রে, বাঁশী,
উগারে অমিয়ারাশি,
কোন্ রন্ধ্রে ব্রজপুর উঠে হে মাতিয়া,—
কোন্ রন্ধ্রে দিলে তান,
গোপীর অবশ প্রাণ,
কদম্ব তলায় বঁধু আসে হে ধাইয়া ?

কোন্ রন্ধ্রে পিককুল মধুরিম গায়,
মলয়ে সুরভি ছুটে,
বসন্ত জাগিয়া উঠে,
অযুত কুসুম দল ফুটে যাহারায় ?

কোন্ রন্ধ্রে মোর নাম,
গাহে বাঁশী অবিরাম,
সে সব শিখায়ে বঁধূ দাও হে আমায়!

তবে বঁধু হাসি হাসি বাঁশরী শিখায়,—
কিশোরী পিরীতি রঙ্গে,
ঢলিয়া কিশোর অঙ্গে,
মোহিয়া বঁধুয়া মন বাঁশরী বাজায়।
শুনি সে বাঁশীর সুর,
মাতিল বরজ পুর,
রাধা সাজি বামে বাঁশী শুনে রসরায়।

কত তন্ত্রে কত মন্ত্রে বাঁশরী বাজায়,—
ছড়াইয়া সুধারাশি,
কম-করে বাজে বাঁশী,
ছুটে আসে গোপীদল কদম্ব-তলায়।
নবছটা হেরি তারা,
হওল আপনা হারা,
বালার হৃদয়খানি বিমোহিত তায়।

ত্রয়োদশ তরঙ্গ।

গোষ্ঠ।

(১)
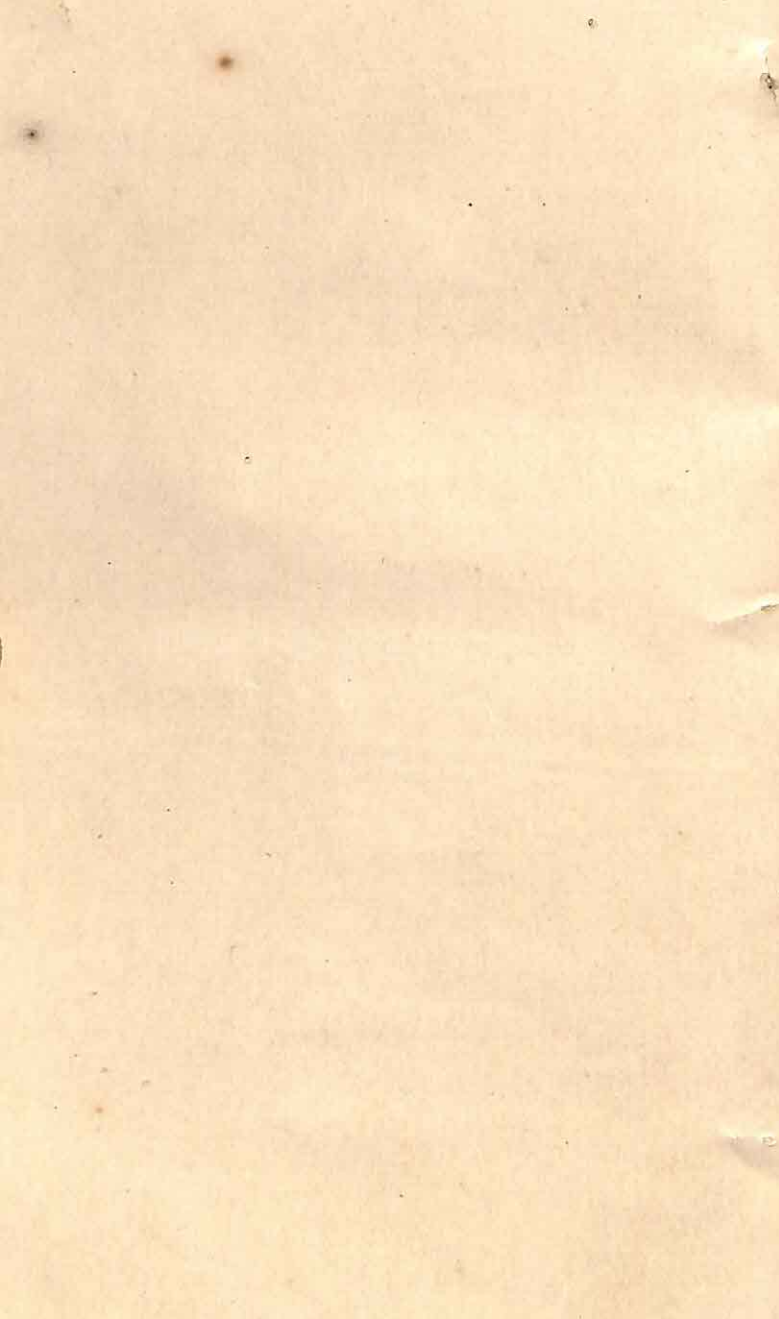
গোঠেতে বাজায়ে বেণু,
মাধব চরায় ধেনু,
ত্রিজগত মাতি উঠে
শুনি সে বাঁশীর তান।

সে বাঁশী যে শুনে মজে,
কুলবতী কুল ত্যজে,
জটিলা কুটিলা তারা (ও)
রহে ঊর্দ্ধ করি কান।

শুনি সে বাঁশীর স্বর,
রাধার মরম ঘর,
উচ্ছাসে উঠিল কাঁপি
ইতি উতি ফিরে চায়।

নীবির বাঁধন নড়ে,
বেণীটি এলায়ে পড়ে,
প্রেমে ডগমগচিত,
কি মাধুরী উথলায়।

কহে রাই সখীগণে,
হেরিবারে শ্যাম ধনে,
চল সবে গোঠে যাই
বিলম্বে নাহিক ফল,—

সখীরা হাসিয়া কয়,
"এ যে সখি অসময়,
শাশুড়ী ননদী যদি
জানে কি হইবে বল ?

পরাণে ধৈরয ধ'রে,
এবে সখি রও ঘরে,
আমরা কুলের বধূ
পদে পদে আছে ভয়।

সাঁঝেতে যমুনাজলে;
যাইব সঙ্গিনীদলে,
হেরিব কদম্বতলে,
সখি শ্যাম রসময়।

শুনিয়া সখীর কথা,
মরমে পাইয়া ব্যথা,
মুছিয়া নয়ন ধারা,
ধীরে বিনোদিনী কয়,

ধৈরয না ধরে প্রাণ,
করিতেছে আনচান,
শ্যাম-পদে দিছি সখি
মোর কুল শীলচয়!

ছিঁড়েছি কুলের ডোর,
কুল কি করিবে মোর,
শ্যাম-প্রেমে ভাসাইয়া
দিছি সখি আপনায়।

তবে আর ভয় কেন,
কেন বা রোদন হেন,
চল দ্রুত হেরি গিয়া
মোর শ্যাম বঁধুয়ায়।

সত্য যদি শ্যামে প্রাণ,
সখিলো দিছিস দান,
সব শঙ্কা পরিহরি
আয় তবে ছুটে আয়।

এত শুনি সখীগণে,
উছানে কিশোরী সনে,
যে দিকেতে বাজে বাঁশী
সেই দিকে ছুটে যায়।

সখী সহ গোঠ মাঝে,
নবীন নাগরী রাজে,
হেরি তাহা ধীরে ধীরে
আসি তথা রসময়,

কহিছে তোমরা হেন,
নীরবে এখানে কেন,
এসেছ হরিতে ধেনু
হেন মোর মনে লয়।

লাজে নত গোপীদল,
রোষে ভেল বিচঞ্চল,
কহে "অসঙ্গত হেন
কেন হে কহিছ কান্?

আমাদের রাজা রাই,
গোধন নাহিক চাই
আনিয়াছি মনোচোরে
দিতে মোরা দণ্ড দান।

চোর বলি কর রোষ,
জাননা নিজের দোষ,
হৃদয়-আগার মাঝে
গোপীর পিরীতি ধন,

ছিল হে গোপনে ঢাকা,
বল দেখি শুনি বাঁকা,
তোমার বাঁশরী তায়
কেন করে আকর্ষণ ?

তোমার বাঁশরী হায়,
কুলের মাথাটি খায়,
এ দুপুরে কুলনারী
টেনে আনে গোঠমাঝ,—

না বুঝি নিজের দোষ,
অন্য জনে কর রোষ,
এ তব কেমন রীতি
স্মরিতে উপজে লাজ।

চোরেতে যে চুরী করে,
টাকা কড়ি লয় হ'রে,
রাজদ্বারে দণ্ড পায়
ভোগ করে কারাবাস।

তুমি বড় পাকা চোর,
কাটিলে মরম ডোর
আবার করিয়া জোর
হৃদে ব'স বারমাস।

তোমার এ গুণগ্রাম,
রাজ পাশে গিয়া শ্যাম,
যদি হে জানাই মোরা
তা' হইলে কিবা হয়?

যে জন আপনি চোর,
তার কেন এত জোর,
তাই বলি সাবধানে
কও কথা রসময়।

এতশুনি মৃদু হাসি,
নটবর কাছে আসি,
কহে "সখি কেন তোরা
মিছা দোষ দিস্ মোর?

মাঠে আসি ধেনু রাখি,
কারো না কথায় থাকি,
কেমনে বলিস তবু
রমণী-হৃদয় চোর!

আমি যবে গোঠে আসি,
ল'য়ে প্রেম-সুধারাশি,
পাতি হাস্য রসফাঁদ
তোরাই চাহিস সই,

সে ফাঁদে কটাক্ষ-ঘায়,
মন-মৃগ প'ড়ে যায়,
বিচারিয়া দেখ তাহে
আমি কোন দোষী নই।

এত বলি রাধিকায়,
প্রেমে আলিঙ্গিতে চায়,
কহে তবে প্রেমময়ী
করিয়া পিরীতি রোষ,—

"কুল রমণীরে হেন,
নিলাজ করিছে কেন,
বল দেখি বিচারিয়া
সখিলো কাহার দোষ ?"

গোষ্ঠ।

(২)

যমুনাকো তীরে গোঠের মাঝে,
বহিঠল শ্যাম রাখাল সাজে।
চৌদিকে রাখাল রয়েছে সাথ,—
তারা ঘেরা যেন রজনীনাথ।
হাম্বা হাম্বা রবে চরিছে ধেনু।
হাসিয়া রসিয়া বাদিছে বেনু।
শুনিল মধুর মুরলী যব্,
উজানে ফিরিল যমুনা তব্।
পশু পাখী সব আপনা হারা,
হওল স্তবধ জগত সারা।

সে স্বর গোপীর পশিয়া কাণে,
অমিয়া ঢালিল সরল প্রাণে !
রাখালের বেশ ধরিয়া তব,
আওল গোঠেতে গোপিকা সব।
ভিন্‌দেশী গোপ নেহারি তবে,
কহিছে কানাই গোপিকা সবে।
"কে রাজা তোদের কোথায় বাস ?
এখানে কি হেতু করি কি আশ ?"
কহিছে তাহারা "শুন হে হরি,
মান নগরেতে বসতি করি।
পায় ধরানর পাড়াতে ঘর,
বুঝিলে কিছু কি রসিকবর ?"
রাইকে দেখায়ে কহিছে তবে,
"ইহাঁরি পরজা আমরা সবে।
যদি হে আপন মঙ্গল চাও,
দাসখত এঁরে লিখিয়া দাও।
নিজ রাজ্যে সুখে রহিবে তবে,
নতুবা আমরা লুটিব সবে।"
এত বলি গাভী ধরিতে যায়,

গোপ সব পথ রোধিতে ধায় !
নিরালায় কানু নেহারি রাই,
করিল চুম্বন বদন চাই।
বালা বলে ভাল রসিকরাজ !
অনাসে সাধিলা আপন কাজ।

সুবল মিলন।

সখা সহ গোঠে কানু
হাস্যরস মাঝে ভাসে,
ধেনুদল মনসুখে,—
বেড়াইছে চারি পাশে।

রাখাল বালকগণ
সাজাতে বিনোদকালা,
মনসাধে সবে মিলি
গাঁথে ফুল গুঞ্জামালা।

সুবল চম্পক দাম
 আনিল মনের সাধে,
বাসনা চম্পক দামে
 সাজাইতে কালাচাঁদে।

হেরি সে চম্পক কানু
 করি কত হায় হায়,
হইল সম্বিত হারা
 ভূমে গড়াগড়ি যায়।

হেরি তা আকুল ভেল
 রাখাল বালকদল,—
কেহ বা বীজন করে
 কেহ মুখে দেয় জল।

তবু এক বিন্দু শ্বাস
 না বহিল একবার,—
সুবল তখন তবে
 ভাবিল উপায় সার।

বুঝিল সুবল সখা
নেহারি চম্পকদাম,
চম্পকবরণী স্মরি
অচেতন ভেল শ্যাম!

সুবল তখন ধীরে
আয়ান-আলয়ে যায়,
"হেথা কেন কোন্ কাজে"
জটিলা সুধায় তায়।

"তোমরা কালারগণ
হেরি বড় পাই ভয়,
কালিয়া ঢালিল মোর—
কুলেতে কালিমাচয়।

সুবল কহিছে হাসি
কিছু তব ভয় নাই,
হারায়েছে বৎস এনু—
খুঁজিতে খুঁজিতে তাই।

হেন কালে রাই সনে
ভেট ভেল নিরালায়,
ধীরে ধীরে সবিনয়ে
কহিছে সুবল তায়—

আনিনু চম্পকদাম
গাঁথিতে মোহনমালা,
তুঁহু স্মৃতি তাহে ভেল
মূরছি পড়ল কালা।

সে দারুণ মূর্চ্ছা তার
কিছুতে না ভাঙা যায়,
নিদান দেখিয়া তার
আসিয়াছি লো হেথায়।

তুমি যদি নিকটেতে
যাও ধনি একবার,
তবে সে দারুণ মূর্চ্ছা
ভাঙিবারে পারে তার।

নতু সে দারুণ মূর্চ্ছা
আর না ভাঙিবে ধনি,
হারাব জনম তরে
মোরা সবে নীলমণি।

এতহুঁ শুনিয়া রাই
তিতল নয়ন-লোরে,
বলিছে "কেমনে যাব
উপায় বলনা মোরে ?

দারুণ প্রহরী সম
শ্বাশুড়ী ননদী ঘরে,—
এক তিল তরে মোরে
আঁখি আড় নাহি করে।"

সুবল কহিছে ধনি
করেছি উপায় তার,
মোর বেশে গোঠে তুমি
কর দ্রুত অভিসার।

পর মোর ধড়া চূড়া
লও এ পাঁচনবাড়ী,
খুলে ফেল আভরণ
দূর কর নীল সাড়ী।

তোমার ও সাড়ী দাও
আমি প'রে ঘরে রই,
সুবল হইয়া তুমি
গোঠে যাও রসময়ি।

তবে না ঠেকিবে ধনি
শ্বাশুড়ী ননদীদায়,—
ঘুচিবে জঞ্জাল সব
জীউ পাবে রসরায়।

এত শুনি দ্রুত ধনী
ধরিল সুবল-বেশ,
মরি মরি কি মাধুরী
হেরিতে ধৈরয শেষ।

বৎস বুকে ল'য়ে ধনী
গোঠ মাঝে ত্বরা যায়,
নবরাগে ভাসে বালা
ফিরে কিছু নাহি চায়।

সুবল বেশেতে ধনী
বসে যথা শ্যামরায়,
সে কর পরশে শ্যাম
নয়ন মেলিয়া চায়।

সুবলে হেরিয়া পাশে
ফেলিয়া নয়নলোর,
কহে শ্যাম বল "কোথা
চম্পকবরণী মোর ?

সে বিনা তিলেক মোর
জীউ না ধরণে যায়,"
এত বলি ঘন ঘন
সুবলের মুখ চায়।

নেহারি কানুর বালা
সে নব উচ্ছ্বাসচয়,
প্রেম অশ্রুনীরে ভাসি
মধুরে মৃদুলে কয়।

"নহি হে সুবল আমি
তব দাসী রসরাজ,
তোমারি পিরীতি দায়ে
সুবল হ'য়েছি আজ।"

তবে প্রেমাবেগে দুঁহে
আলিঙ্গিল দুজনায়,
সে মাধুরী হেরি বালা
হারাইল আপনায়।
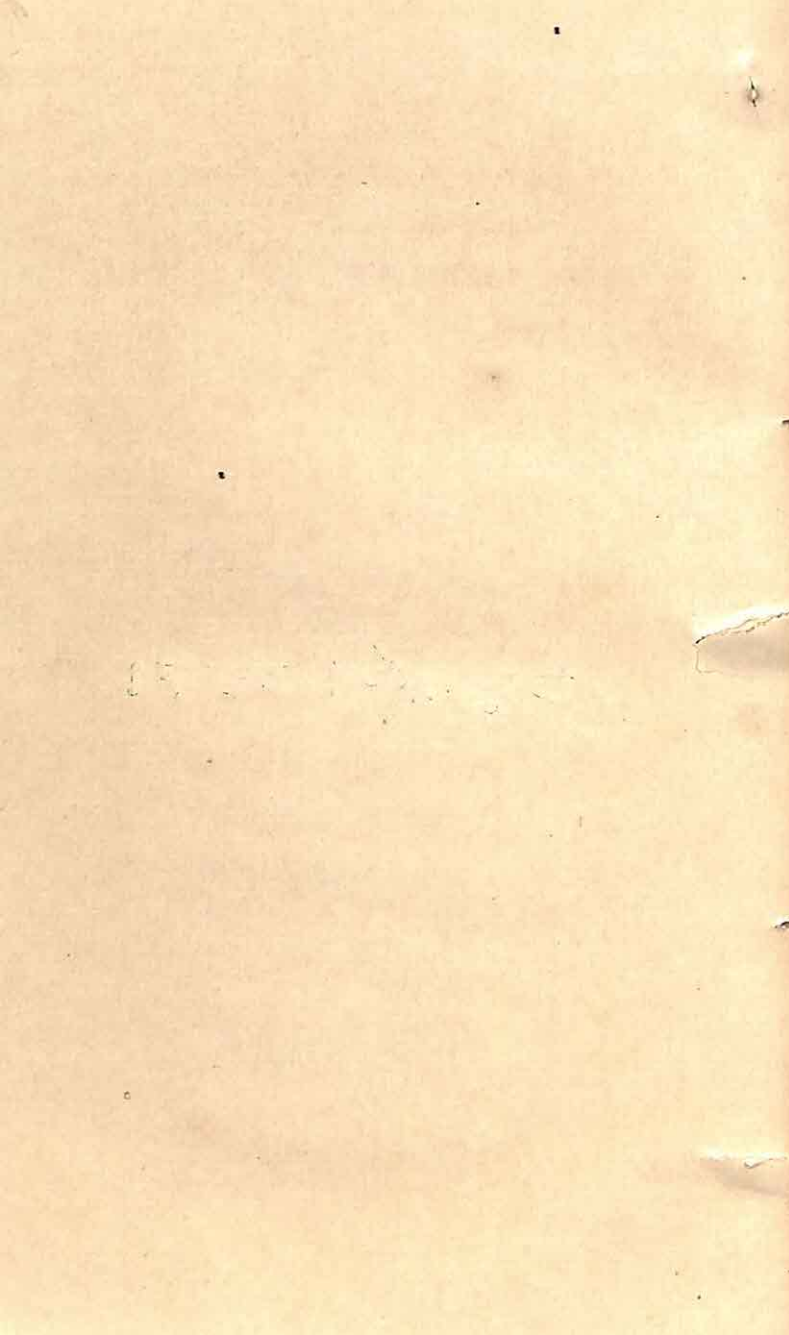
চতুর্দ্দশ তরঙ্গ।

দুর্জ্জয় মান।

১

আর না হেরিব সখি কালবরণ,
কালা বঁধু শঠ বড়,
নারী বধে অতি দড়,
হেন আর না দেখি কখন।
বংশীদ্বারে হরি মন,
হয় শেষে অদর্শন,
মুখামৃতে হরে লো জীবন।

আর না হেরিব সখি কালবরণ,—
হেরি কাল কোকিলায়,
পরাণ জ্বলিয়া যায়,
কাল কেশ করিব বর্জ্জন।
এ দুটি নয়নতারা,
আজিলো করিব সারা,
কাল নাহি করিব দর্শন।

দুর্জ্জয় মান।

১

আর না হেরিব সখি কালবরণ,
কালা বঁধু শঠ বড়,
নারী বধে অতি দড়,
হেন আর না দেখি কখন।
বংশীদ্বারে হরি মন,
হয় শেষে অদর্শন,
মুখামৃতে হরে লো জীবন।

আর না হেরিব সখি কালবরণ,—
হেরি কাল কোকিলায়,
পরাণ জ্বলিয়া যায়,
কাল কেশ করিব বর্জ্জন।
এ দুটি নয়নতারা,
আজিলো করিব সারা,
কাল নাহি করিব দর্শন।

১৯৩]
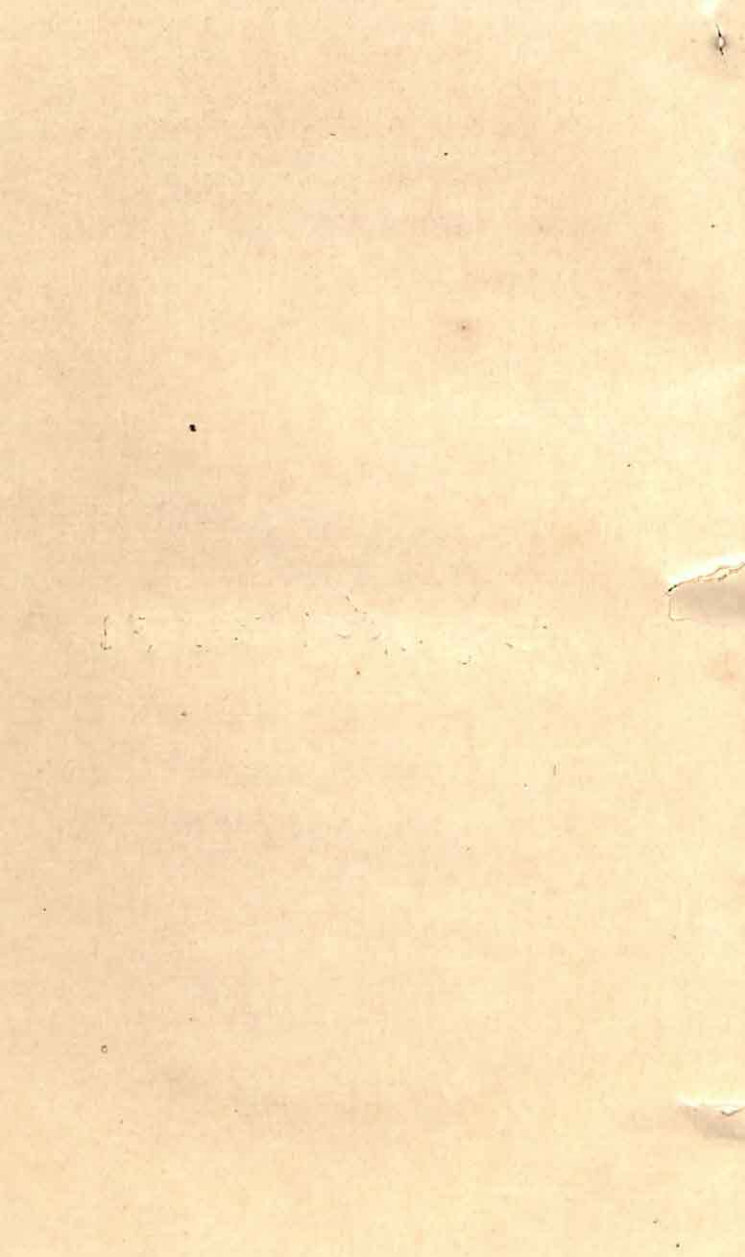
না হেরিব আর সখি কালবরণ,—
কালিন্দির কাল জলে,
লইয়া সঙ্গিনীদলে,
আর নাহি করিব গমন।
হৃদয় হইল চূর,
কাল হ'তে রব দূর,
সহেনা সহেনা এ জ্বালা ভীষণ।

আর না হেরিব সখি কালবরণ,
হেরি সই কাল মেঘ,
উথলে হৃদয়-বেগ,
কাল হেরি হই অচেতন।
কালা-প্রেমে জ্বলে চিত,
না বুঝিয়া হিতাহিত,
কাল বিষ করেছি ভক্ষণ।

হেরিবনা আর সখি কালবরণ,
ল'য়ে অনুরাগ ভার,
কদম্ব তলেতে আর,

ভুলেও না যাইব কখন।
কালাস্মৃতি যাহে আছে,
যাইবনা তার কাছে,
হেরিব না আর সে বদন।

আর না হেরিব সখি কালবরণ,
দেখ সখি মোর পাশে,
কালা যেন নাহি আসে,
কুঞ্জদ্বার করিও রক্ষণ।
নিষেধিলে যদি আসে,
ল'য়ে যেও রাজ-পাশে,
পুষ্পডোরে করিয়া বন্ধন।

দুর্জ্জয় মান।

২

আসি শ্যাম রাই পাশে।
গললগ্ন কৃতবাসে,
কহে প্রেমময়ি ক্ষমলো মোয়।
হেরি সখি তুহুঁ মান
হের যায় মঝু প্রাণ,
সরল পরাণে কহিনু তোয়।

এত বলি পদোপর,
কানু অরপিলা কর,
রোষই রাই ফটকল হাত।
তবুও সাহসভরে,
যুগল চরণ'পরে,
মান তরেতে পড়ে প্রাণনাথ।

তবু মান শান্ত নয়,
ধনী নাহি কথা কয়,
আপন মনে লিখই ধরণী।
আকুল হইয়া তবে,
কহে কানু সখী সবে,
কি অব্ করব কহ সজনী!

সখীরা রুষিয়া কয়,
ভাল বটে রসময়,
নিতুই মোরা কতই শিখাব!
নিতি নব দোষে কান্,
তুঁহিঁ বাড়ায়সি মান,
আই আই শরমে কোথা যাব!

কতবেরি কহিলাম,
দোখ না করসি শ্যাম,
তবহিঁ তুঁহি না ছোড়লি দোষ,
দোষ করি সাধ পায়,
নিতি কত ক্ষমা যায়,
অবহুঁ কাহে বৃথা আপশোস।

সখীরা নিঠুরা হ'য়ে,
দূরে গেল এত ক'য়ে,
নয়নলোরে ভাসে রসরায়।
বসি বঁধু নিরজনে,
ভাবই আপন মনে,
অবহুঁ কি করব উপায়।

দুর্জ্জয় মান।

৩

কহিছে বঁধুয়া সখীর ঠাম।
আর দোষ নাহি করব হাম।
ধরিলো তোদের সবার করে,
মিলাও মানিনী করুণাভরে।
যাহে অভিমান ছোড়ব রাই
মোরে দয়া করি করলো তাই।

সখীরা কহিছে কভি না হোয়,
বার বার কত কহব তোয়।
কুঞ্জে যেতে মানা করেছে রাই,
তব্ কাহে পথ রয়েছ চাই।
তোমার দোষেতে পাইয়া ব্যথা—
কহিল গো ধনী মরম কথা।
কালবরণ না হেরিবে আর
নিষেধ তোমার নিকুঞ্জদ্বার।
যেখানে নিশীথে ছিলে হে শ্যাম,—
যাও হে তুরিতে গো ধনী ঠাম।
এক ফুলে যাহার পিরীতি নাই,
না হেরে তাহার বদন রাই।
এতই বলিয়া সখীরা যায়।
পড়ল বঁধুয়া বিষম দায়।

বিদেশিনী।

নবীনা ষোড়শী এক বীণায় তুলিল সুর,
উঠিল সে তানে মাতি এ সারা বরজপুর।
শুনি সেই তানলয়,
রাই মূরছিত হয়,
কেমন হৃদয়খানি কাঁপিতেছে দুরুদুর।

কে বাজায় হেন বীণা মাতায়ে রাধিকা-প্রাণ।
চলিল দেখিতে সখী কোথা হ'তে আসে তান।
নেহারিল সহচরী,
যমুনা সৈকত'পরি,
নবীনা ললনা এক বীণায় গাহিছে গান।

সুধাইল "কেগো তুমি তুলেছ ললিত স্বর,
ও ধ্বনিতে শ্রীমতীর চিতখানি জ্বর জ্বর।
তোর বীণা শুনি যেন,
কানুর বাঁশরী হেন,
মূরছিত হ'য়ে রাই পড়িয়াছে ধরাপর।

কানু বিনা প্রাণখানি ছিল শুধু রাধিকার,
কোথা হ'তে এলি তুই সেটুকু হরিতে তার ?"
শুনিয়া ষোড়শী কয়,
"কেন ধনী কর ভয়,
শুনিয়া বীণার তান কোথা প্রাণ গেছে কার ?

আমি বিদেশিনী বালা বহুদূরে মোর ঘর,
পিরীতি গরলে মোর চিতখানি জ্বর জ্বর।
নিঠুর পুরুষ জনে,
প্রেম ঢালি প্রাণপণে,
করিতেছি নিতি পূজা বসায়ে হৃদয়োপর।

সে দিছে হৃদয় খানি ভাঙি মোর উপেখায়,—
আন সনে বঞ্চে নিশি তেয়াগিয়া সে আমায়
তাইলো কাতর হ'য়ে,
সে তীব্র বেদনা ব'য়ে,
হেথা সেথা ঘুরে মরি করি শুধু হায় হায়।

গাহিছে এ বীণা নিতি আমারি মর্ম্মের গান।
আমারি প্রাণের ব্যথা সখি এর তান মান।
এবে সাধ লো আমার,
পুরুষ জনেরে আর,
দিবনা প্রণয়-প্রীতি এ দেহে থাকিতে জান।

এখন বাসনা এই কোন রসবতী পাই,
তাঁর কাছে দাসী হয়ে থাকি সখি সর্ব্বদাই।
প্রেমে পূজা করি তার,
ঘুচাই বিষাদ-ভার,
এখানে এসেছি আজ খুঁজিতে খুঁজিতে তাই।

শুনিনু এখানে আসি রাধানামে এক ধনী,
বড় নাকি রসবতী বিমল প্রেমের খনি!
তুমি মোরে করুণায়,
দাসী করি তার পায়,
রাখিবারে চির তরে পার নাকি লো সজনি!

দাসী হ'য়ে যদি সখি ঠাঁই লভি তার পায়,—
শুনিব তাহার দুখ মোর দুখ কব তায়।
ঢালি মোর আঁখিজল,
ধুব তাঁর পদতল,
তাঁর আঁখিধারা পাতি লইব লো এ হিয়ায়।

হাসিয়া কহিছে সখি "এই কি দাসীর কাজ ?"
শুনি কহে বিদেশিনী মরমে পাইয়া লাজ।
আদেশ পাইলে পর,
সাজাব নিকুঞ্জ ঘর,
বনফুলে ক'রে দিব বঁধুয়া মোহিনী-সাজ।

ঈঙ্গিত পাইলে তাঁর কহিব বঁধুয়া জনে,
ভাঙ্গিতে দারুণ মান ধরি দুটি শ্রীচরণে।
বঁধুয়া মিলন তরে,
লয়ে যাব কুঞ্জঘরে,
নিদ্রার কোমল কোলে শুতিলে গুরুয়াগণে।

শিখাইব সমাদরে বঁধুরে করিতে মান,—
শিখাইব প্রেমকলা যদি লো শিখিতে চান।
সখী মোর মাথা খাও,
আমারে লইয়া যাও,
তাঁর সে চরণে আমি দিব চির-আত্মদান।

এত শুনি তবে সখী ধরি বিদেশিনী কর,
ল'য়ে যায় রাই পাশে প্রেমে চিত গর গর।
প্রেম রসে ভরা প্রাণ,
বীণায় তুলিয়া তান,
রাই ভেটিবারে যায় বিদেশিনী অতঃপর।

বীণা ধ্বনি শুনি রাই বাহিরিল ছাড়ি ঘর,—
সমাদরে বসাইল ধরি ধনী তঁহিকর।
মাতায়ে সবার প্রাণ,
বীণায় ছুটিছে তান,
শুনিছে নীরবে রাই চিত কাঁপে থর থর।

বলে রাই "হেন বাঁশী বাজায় লো নটবর;
"রাধা" নামে তার বাঁশী সাধা সখি নিরন্তর।
দারুণ মানের ভরে,
তেয়াগিনু সো নাগরে,
তাহার বিরহে এবে হিয়া মঝু জর জর।

তোরে হেরে দূরে গেল আজি সে সকল দুখ,
প্রভাত হইল আজি দেখি বা কাহার মুখ!
বল্ কি বাসনা তোর,
যাহা কিছু আছে মোর,
তোর পদে ঢেলে দিয়া চাহি লভিবারে সুখ।

এত শুনি বিদেশিনী মধুরে মৃদুলে কয়,—
শুনিয়াছি রাই তুমি বড় নাকি দয়াময়!
তাই লো তোমার পাশে,
এসেছি করুণা আশে,
বাসনা তোমারে সেবি ঘুচাব বেদনাচয়।

প্রেমের দেবতা সখি তুমি লো হইবে মোর,—
তোমার প্রীতির লাগি এ হৃদি করিব ভোর।
তোরে ঢালি ভালবাসা,
মিটাব প্রেমের আশা,
পরিবে কি তুমি ধনি বল মোর প্রেম-ডোর?

রাই কহে "তুহুঁ গুণে বিমোহিত এ জীবন,
এমনি অমিয়ামাখা ছিল সে বঁধুয়া ধন।
তোরে—দিতে কিছু উপহার,
বড় সাধ লো আমার,
কিন্তু কিবা দিব বল নাহি তব যোগ্য ধন।

কহে তবে বিদেশিনী প্রেম রসে ভরা প্রাণ,
দিতে যদি সাধ দেহ তব মানটুকু দান।
তখন গোপিকাদল,
বুঝিল কানুর ছল,
দারুণ মানের দায়ে মাধব পাইলা ত্রাণ।

সপ্তদশ তরঙ্গ।

জলকেলী।

সিনান সময় ভেল
যতেক সঙ্গিনী দলে,—
শ্রীমতীরে ল'য়ে সাথে
চলিলা যমুনা-জলে।
বসন রাখিয়া তীরে,
যতেক গোপীকা ধীরে,
রসে ডগমগ চিত্ত
নামিল যমুনা মাঝ,
উদিল একত্রে যেন
শত দ্বিজরাজ-রাজ।

জল ফেলা ফেলি করে
মিলিয়া সঙ্গিনীগণে,
কেহ হারে কেহ জিনে
কেহ কারে তুল্য রণে।

আলুলিত কেশদল,
চুমিছে যমুনা জল,
নবীন নীরদ যেন
তেয়াগিয়া নভকায়,
কত আশা বুকে ল'য়ে
পশিয়াছে যমুনায়।

হেন কালে সেই খানে
দেখা দিলা নটবর,
বিভল গোপীকাকুল
লাজে চিত থরথর।
না হইল কেলী সারা,
সবাই আপনা হারা,
রসিক শেখরে হেরি
সবে লাজে স'রে যায়।
খান খান হ'য়ে যেন
বিজুরী আকাশে ভায়।

আহামরি কিবা তাহে
নবশোভা উথলায়,—

ফুটল নলিনীদল
যেন সারা যমুনায় !
নামি কানু, যমুনায়,
পুন যত গোপীকায়,
একত্রে মিলায়ে করে—
জলকেলি নব ঠাম,
এক দিকে গোপীকুল
একা একদিকে শ্যাম।

তবু গোপীদল নারে
জিনিতে নাগর রাজ,—
ছরম হওলো বড়
মরমে পাওল লাজ।
ছরমে গোপীকাগণ,
হওল বিভল মন,
খেলা সারি পরে সবে
আপন ভূষণ বাস
রাধার মরমে জাগে
বঁধুয়া মিলন আশ।

মুখে না ফুটিল ভাষা
নয়ন বলিল সব,
আঁখি পথে প্রেম-ভেট
অরপিলা সো মাধব।
তখন সে দুটি প্রাণ,
প্রেমাবেগে আনচান,
উভয়ে উভয়ে হেরে
ভাবরসে নিমগন।
হেরি সে প্রেমের ভাতি
বিমোহিত সখীগণ।

ইষ্টদেবে পূজিবারে
মিলিয়া সঙ্গিনী যত
এনেছিল তুলি ফুল
নিজ নিজ মনোমত
সেই ফুলে গাঁথি মালা,
সখীরা সাজায় কালা,
কানুও গাঁথিয়া মালা দিলা রাইকণ্ঠোপর
অতঃপর গেলা দোঁহে নিভৃত নিকুঞ্জ-ঘর।

সপ্তদশ তরঙ্গ।

মধ্যাহ্নলীলা।

(১)

রাধাকুণ্ড তীরে
রাধামাধব খেলায়,—
হেরি সে মধুর ছবি, মোহিত ভকত সবি,
শত আঁখি ল'য়ে বিশ্ব
সে মাধুরী চায়।

হেরি সে সুষমা ঢেউ
ছোটে তট পানে।
নলিনী প্রেমেতে মাতি, হেরে সে যুগল ভাতি;
পাপিয়া মিলন গীতি
গাহে মৃদু তানে।

রবিকর ধীরে চুমে
দুঁহার বদন,
শ্রমজলে ভাসে কায়, বসন ভিগল তায়,
তবে যত সখীগণ
করিয়া যতন—

নবীন পল্লব রাজি
আনিয়া তখন,
তঁহি রচে কুঞ্জবন, কি মাধুরী অতুলন,
নব কিশলয়ে সেজ
করিল রচন।

নাগর নাগরী রাজে
তাহার মাঝার,
দুঁহে বাঁধা ভুজ পাশে, দুঁহে মৃদু মৃদু হাসে,
দুঁহে দুঁহু চুমে বহে
সুখের পাথার।

কভু রাই অঙ্গে কানু
পড়ত ঢুলিয়া,
কভু রাই শ্যাম-অঙ্গে, লুটিছে পিরীতি রঙ্গে,
কভু বা আবেশে পড়ে
ধূলায় লুটিয়া।

শত চুম্ব দিয়া মুখে
বঁধুয়া তখন,
নাগরী লইয়া বুকে, ডুবিলা পিরীতি সুখে,
লাজময়ী কমলিনী
আনত বদন।

নবীনা নাগরী বালা
নাহি টুটে লাজ,
ধরি কর বঁধুয়ার, করে শত পরিহার,
না শুনই পিয়া-বাণী
সো রসিকরাজ।

মধ্যাহ্ন-লীলা।

২

নবীন পল্লবে কুঞ্জ করিয়া রচন
তার মাঝে রাই কানু নিল সখীগণ।
নাহিক তপন-তাপ শ্যাম স্নিগ্ধ ছায়,
সখীগণ দুই পাশে চামর ঢুলায়।
ঢলঢল দুহুঁ তনু প্রেমে নিমগন,
দুঁহে দুহুঁ মুখ হেরে ঢুলই নয়ন
সেই প্রেম চাহনীর তুলা নাহি আর,
যে দেখিল সে চাহনী সেই সাক্ষী তার।
দুঁহে দুহুঁ ভুজে বাঁধা নয়নে নয়ন
দারিদ্র রতন সম দুঁহার দুজন।
ছাড়িতে তিলেক তরে কেহ না পারয়,
আঁখি পালটিতে নারে বিচ্ছেদের ভয়।

অষ্টাদশ তরঙ্গ ।

আরাত্রিক।

১

সন্ধ্যা আগমন,
করি দরশন,
করিয়া যতন,
কুঞ্জের ভিতর,
দীপ মনোহর,
জালে সখীগণ।
সাজাইতে কালা,
গাঁথে ফুল মালা,
মনের মতন।

করি রত্ন ঝারি,
সুবাসিত বারি,
রাখিল যতনে,
দ্বারের নিকট,
সুমঙ্গল ঘট,

রাখে সখীগণে।
মিলি সখীকুল,
আনি চারু ফুল,
পাতে কুঞ্জবনে।

কুঞ্জের সমীপ,
রাখে ধূপদীপ,
অগুরু চন্দনে।
রতন আসন,
বিছায় তখন,
প্রেমে সখীগণ।
আসিয়া নাগর,
সো আসন পর,
বসিলা তখন।

তবে বঁধুয়ায়,
সখীরা সাজায়,
কুসুম ভূষণে।
সাজাইয়া রাই,
আনিয়া তথাই,

বসায় আসনে।
দুহেঁ দুহুঁ রূপে,
ডুবে চুপে চুপে,
বিভল জীবনে।

খোল করতাল,
বাজিছে রসাল,
মথিয়া জীবন,
প্রেম-ভোর হ'য়ে,
রত্নদীপ ল'য়ে,
ললিতা তখন,—
আরতি করয়,
সুধা বরিষয়,
কিবা অতুলন।

কিবা সে সুষমা,
না মিলে উপমা,
বিশ্ব আত্মহারা।
সে প্রেম মিলনে,
তারা বধূগণে

ঢালে প্রেম-ধারা,
শিশির ছলায়,
পড়ে তা ধরায়
হ'য়ে মাতোয়ারা।

আরাত্রিক।

(২)

বসিঠল রাই কানু রতন আসনে,
দুপাশে চামর বায় করে সখীগণে।
চৌদিকে কুসুমদল সুরভি ছড়ায়।
উছলিছে কুঞ্জবন চাঁদিমা ছটায়।
খদ্যোৎ মালিকা যত নবীন প্রবালে,—
হীরকের বিন্দু সম কিবা শোভা ঢালে।
হেরি সে মধুর ছটা তারকা নিকর—
আপন সপত্নী ভাবি ঝোপের ভিতর,—
ঘোমটা খুলিয়া ধীরে নীরবেতে চায়।
উথলি উঠিল কুঞ্জ সে পূত ছটায়।

গন্ধপুষ্প ধূপ দীপ লইয়া তখন,
ললিতা আরতি করে মনের মতন।
উঠিল শঙ্খেতে কিবা সুমঙ্গল তান,
ভাতিল কি যেন তাহে জীবনের গান।
মধুর আরতি কিবা যাই বলিহারি,
ভকত বলিছে জয় কিশোর পিয়ারী!

ঊনবিংশ তরঙ্গ।
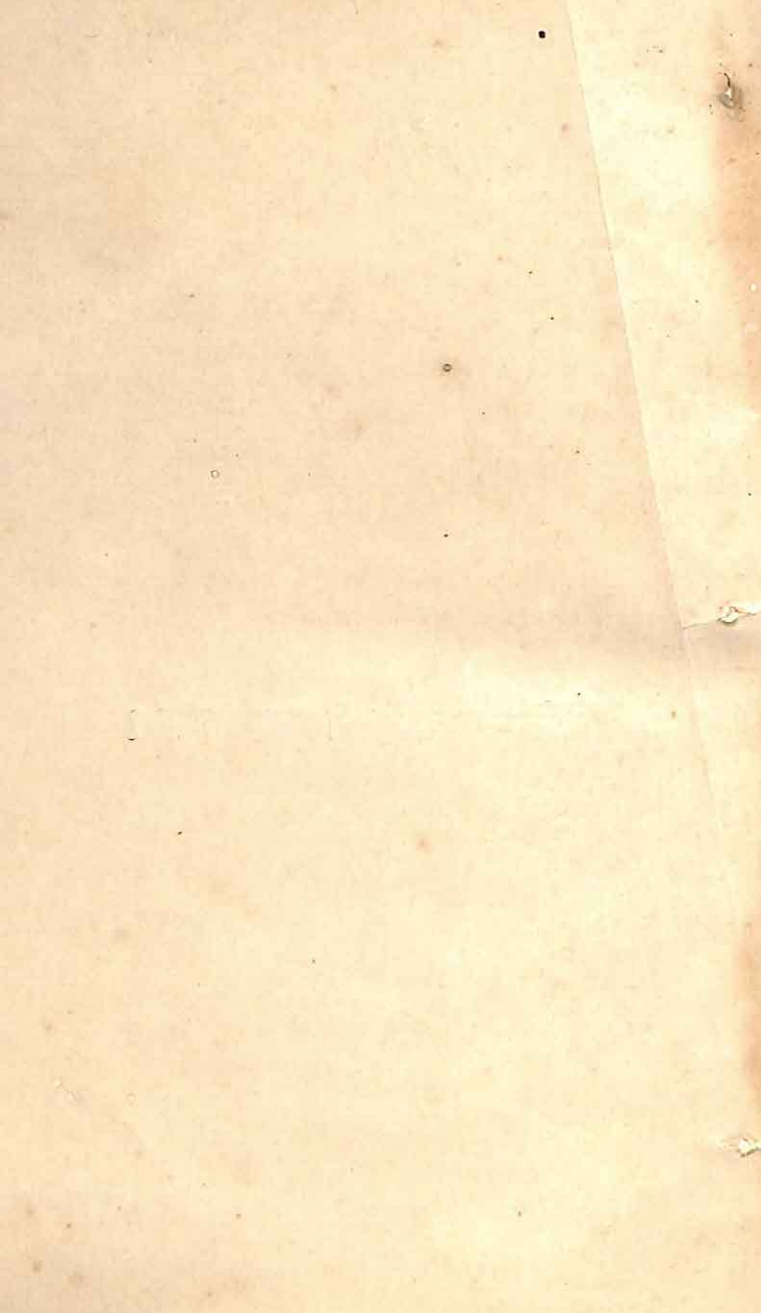
রসালস।

জাগরণে শ্রান্ত
কিশোর কিশোরী,
যতন করিয়া
যত সহচরী—

কুসুমে পালঙ্ক
বালিশ করিল,
নব কিশলয়ে
শেজ বিছাইল।

প্রেমাবেগে দুহুঁ
চিত ঢল ঢল,
শুতল কিশোর
কিশোরী যুগল।

মেঘেতে জড়িত
বিজলী যেমন,
নিদাবেশে দুঁহে
শুতল তেমন।

রয়েছে বদনে
চর্ব্বিত তাম্বূল,
শিথিল ওড়না
অঙ্গের দুকুল।

খসিয়া প'ড়েছে
অঙ্গের ভূষণ,—
বঁধুর চুড়াটি
খুলেছে তখন।

কিশোরীর বেণী
লুটিছে শয্যায়
ফণি মানি তাহে
ভ্রম উপজায়।

অঝোরে ললাটে
ঝরিতেছে ঘাম,
মুছে গেছে তাহে
অৰ্দ্ধচন্দ্র দাম।

মরি মরি কিবা
এ যুগল রাজে।
চন্দ্র—বুকে কুমু
যেন সর মাঝে।

বিংশ তরঙ্গ।

কুঞ্জভঙ্গ।

সরায়ে আঁধার ঘটা,
ছড়ায়ে রক্তিম ছটা,
উদিয়াছে পূর্ব্বাকাশে সোনালী তপন।
চমকি উঠিয়া রাই,
কহিছে বঁধুরে চাই,
জাগ জাগ জাগ ত্বরা রাধিকা-রমণ।

মুদিত চাঁদিমা ছবি,
পূরবে উঠেছে রবি,
কেমনে এখন গৃহে করিব গমন!
শ্বাশুড়ী ননদী যবে,
সুধাবে কি কব তবে,
বলহে কেমনে বঁধু দেখাব বদন!

দারুণ পড়সীগণ
সদা বলে কুবচন,
তাহে যদি দেখে হ'তে কুঞ্জের বাহির,—
গঞ্জনার ঘায়ে প্রাণ,
করিবে হে খান খান,
হের মোর আতঙ্কেতে কাঁপিছে শরীর।

শুধু কলঙ্কের তরে
প্রাণ মোর নাহি ডরে,
তোমারে যদি হে কেহ বলে কুবচন,
মরণ অধিক হবে,
সে আমারে নাহি সবে,
তাই ভাবি ওহে বঁধু কি করি এখন!

উঠিয়া নাগর বর,
ধরি বিনোদিনী কর,
কহে ধনি কেন হেন ভয় অকারণ?
নারী সাজ পরিহরি,
রাখালের বেশ ধরি,
গৃহে চল না লখিবে পথে কোনজন।

দারুণ কুলের লাজে,
তবহিঁ রাখাল সাজে,
গৃহে যাইবারে ধনী করে আয়োজন।
আঁখি নীরে দুজনায়,
পথ খুঁজে নাহি পায়,
বালা করে মন দুখে রবিরে নিন্দন।

একবিংশ তরঙ্গ।

রসালাপ।

স্থধাইলা কমলিনী চাহি প্রাণ কালারে,
কেন ভালবাস এত আহিরিণী বালারে !
ব্রজে আছে কতশত রূপবতী ললনা.—
তাহে কেন বাঁধানও একবার বলনা !

আমিত জানিনা বঁধু তুয়া সেবা করিতে,
মুগধিনী থাকি শুধু ডুবি মান সরিতে।
তবুও তবুও কেন এত ভাল বাসিছ
এ মুখ চাহিয়া কেন সদা প্রেমে ভাসিছ !

প্রিয়াবাণী শুনি কানু কহে প্রেমে ঢলিয়া
"কেন ভালবাসি তোরে কি জানাব বলিয়া
ভাষায় সে ভাষা আমি খুঁজিয়া না পাই লো
ওরূপ তরঙ্গে আমি শুধু ভেসে যাই লো !

আমার সৌন্দর্য্য যত সবি তুঁহু মিলনে
শরত আগমে যথা কাশ * নদী-পুলিনে
সারাধরা উঠে ধনি মোর রূপে মাতিয়া
এ চিত উথলে শুধু তুঁহু রূপ ভাতিয়া।

তিল না হেরিলে তোরে রহি মর্ম্মে মরিয়া
দরশ তিয়াসে আঁখি সদা মরে ঝরিয়া
তুহুঁ নামে শিখি পাখা আছে শির রাজিয়া,
তোমারি নামেতে মোর বাঁশী উঠে বাজিয়া।

তুহুঁ নামে দাসখত লিখে দিছি যতনে,
বহি যে নন্দের বাধা সে তোমারি কারণে।
তুহারি প্রেমেতে মোর বাস ব্রজ ভূবনে,
দেখ দাসে ভুলিওনা ঠাঁই দিও চরণে।

এত বলি প্রেয়সীর পদদুটি ধরিয়া,—
রসিক মাধব পড়ে প্রেম রসে ঢলিয়া
প্রেমের তুফান ছুটে দুহাঁকার মরমে।
বালা করে আত্মহারা হবে প্রেম ধরমে।

---

* কাশ—কাশফুল।

নিবেদন।

কহিছে রাধিকা বঁধুয়া ঠাঁই,
তুহুঁ বিনা মেরা আপন নাই।
তুহাঁরি কলঙ্কে করিয়া হার,
করেছি বঁধুয়া ভূষণ সার।
পূরবিক পুণ্য কতই ছিল,
তুয়া হেন নাহ তাই মিলিল।
আমি গুণহীনা মুগধা নারী
তুয়াগুণ কিবা কহিতে পারি।
নিজগুণে ঠাঁই দিয়াছ পায়;
রেখহে বঁধুয়া চরণ ছায়।
কি আর মাধব কহিব তোরে,
চরণ ছাড়া না করসি মোরে।
অবলা নিয়ত করে হে দোষ,
ক্ষমিও বঁধুহে না কর রোষ।
এই নিবেদন রাখিও মোর,
ওহি পদে চির হওনু ভোর।

সমাপ্ত।

14	15	16	17

সুধাংশু পাত্র
চাঁদের দেশ

চাঁদের দেশ

সুধাংশু পাত্র

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলকাতা-৭০০০৭৩

দে'জ সংস্করণ
বইমেলা
ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১
মাঘ, ১৩৯৭

প্রকাশক :
শ্রীসুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ : গৌতম রায়

মুদ্রাকর :
শ্রীমতী বীণাপাণি মিশ্র
বীণাপাণি প্রেস
১২/১এ, বলাই সিংহ লেন
কলকাতা ৭০০০০৯

দাম : ২০ টাকা
Rupees Twenty only.

সূচীপত্র

এই লেখকের অন্যান্য বই

ভারতের মহাকাশ গবেষণা ও অগ্নি
পশুপাখি ও পতঙ্গদের গপ্পো
সভ্যতার আদিপর্বের আবিষ্কার ও তৎপরতা
বিজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত
জীবজগতের বিস্ময়
পদার্থ বিজ্ঞানের সহস্র জিজ্ঞাসা
মহাকাশ বিদ্যা ও কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবস্থা
বিজ্ঞানী প্রসঙ্গ
বিজ্ঞানী চরিতকথা
বিজ্ঞানে অমর প্রতিভা
মনের মতো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের গপ্পো
ভৌগোলিক আবিষ্কার ও অভিযান
ছোটদের বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা
বিশ্ব পরিবেশ ও মানুষ
জীবনের জয়যাত্রায় মানুষ
আজকের বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা
বিজ্ঞানের সহজ পাঠ
খাদ্য, পুষ্টি ও পরমায়ু
মহাসাগরের মহাবিস্ময়

ঃ চাঁদের দেশ ঃ

খোকা একটু যেমন বড় হয়েছে, তেমইন দুষ্টুমি বেড়েছে তার একশ গুণ। খেতে চায় না, বসতে চায় না, মায়ের কোলে থাকতেও চায় না। ঝড়ো হাওয়ার মত ছুটতে চায়, পাখীর মত আকাশের এপার থেকে ওপারে পাড়ি জমাতে চায়, নীল আকাশটা ফুঁড়ে ছিটকে বেরিয়ে যেতে চায়।

মা দুধের বাটি হাতে জোর করে খোকাকে কোলে নিয়ে বাহিরে আসেন। আকাশের চাঁদের দিকে তাকিয়ে ছড়া কাটেন—

নীল আকাশের কোলে
রুপোলী চাঁদ দোলে,
খোকন সোনা মায়ের কোলে
দোলে দোদুল দোলে।

আকাশের চাঁদটাকে খোকার বেজায় লোভ। ঝলমলে গোল একখানা আয়নার মত, রুপোর থালার মত, দুর্গা ঠাকরুণের তলায় অসুরের হাতের ঢালটার মত, আকাশের ঐ চাঁদকে দেখলে মন তার উড়ে যেতে চায়, হারিয়ে যেতে চায়, নীল আকাশের গায়ে বিলীন হয়ে যেতে চায়। দুষ্টুমি ভুলে গিয়ে দুধের বাটিতে চুমুক দিতে দিতে বলে—মা, চাঁদকে এনে দাও। আমি খেলা করবো।'

মা চাঁদের দিকে হাত বাড়িয়ে পুনরায় ছড়া কাটেন—

আয়রে চাঁদ আয়না,
ধরছে খোকা বায়না!
বিজলী বাতি সারি সারি,
ঘরে পাতা খাট মশারি,
ঝির ঝির ঝির পাখার বাও,
তপ্ত শরীর জুড়িয়ে নাও।
চুক চুক চুক দুধ খাও।

মায়ের চাঁদের সাথে খেলা করতে আকাশের চাঁদটা নেমে আসে না। খোকা শুধোয়—চাঁদ কেন আসছে না মা?

মা বললেন—চাঁদ যে অনেক—অনেক দূরে! দু লাখ চল্লিশ হাজার মাইল দূরে। লাট্টুর মত পাক খেয়ে খেয়ে সব সময় তাকে ঘুরতে হয় আমাদের এই পৃথিবীটার চারদিকে। আসতে তার সময় কোথায়!

খোকা বললে--তাহলে আকাশ থেকে ওকে পেড়ে এনে দাও !

মা মুচকি মুচকি হাসলেন। বললেন—চাঁদকে পেড়ে আনা যাবে না। তুই বড় হলে চাঁদে যাবি। বায়ু ভরা পোষাক বানাবি, নকল একটা চাঁদ বানাবি, আর বানাবি রকেট। তারপর নকল চাঁদের ভেতরে বসে, জমকালো সেই পোশাক পরে, রকেটের মাথায় চেপে, সাঁ সাঁ করে ছুটে যাবি কালো আকাশের বুক চিরে। নেমে পড়বি চাঁদের দেশে। ভারি মজা পাবি !

খোকা হাততালি দিতে দিতে বললে—কী মজা ! কী মজা !

মা সুযোগ বুঝে দুধের বাটিটা পুনরায় খোকার মুখে গুঁজে দিয়ে বললেন—কী মজা ! কী মজা !

খোকা যাবে চাঁদের দেশে
নকল চাঁদে চড়ে,
মায়ের সাথে কইবে কথা
আকাশ ঘাঁটি গড়ে।

খোকা এবার রীতিমত মজা পায়। ফোকলা মুখে তোৎলাতে তোৎলাতে বললে— মিষ্টি তুমি চাঁদ মামাগো
যাবো তোমার পরে,
বাঁধন হারা আলোর ঢেউ
দেখবো ঘুরে ঘুরে।

মা হাসলেন। পুনরায় শুরু করলেন ছড়া বলতে—

আলো নয়রে কালো চাঁদ
ধার করা তার আলো,
তোদের পানে চেয়ে আছে
মুছতে বুকের ধুলো।

খোকা বললে—তুমিও যাবে আমার সাথে !

মা বললেন—যাবো বৈকি ! সেখানে ছোট বড় পাথরের চাঁই বিরাট সব দৈত্যির মত আকাশ থেকে ছুটে আসছে, পথ আগলে আছে বড় বড় পাহাড় আর গভীর গভীর খাদ, সূর্য্যি মামার বুক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে আসছে, সূচের ডগার মত হাজার হাজার কিরণ তোকে সামলাতে হবে না !

খোকা বুকটা টান টান করে বললে—ওদের আমি ভয় পাই না। দৈত্যি দানাদের গুলি করে ফাটিয়ে দেবো, মজা করে পাহাড়ে চড়বো,

আর এক এক লাফে খাদগুলো ডিঙিয়ে যাবো। তুমি শুধু আমার সাথে সাথে থাকবে আর ছড়া বলবে। ছড়া আমার খু-উ-ব ভাল লাগে।

মা হেসে হেসে বললেন—চাঁদে যে বাতাস নেই, ছড়া শুনবি কেমন করে?

খোকা গুম হয়ে ভাবলে। তারপর বললে—তাহলে চাঁদে গিয়ে কাজ নেই মা।

ঃ তুলসী মামার গপ্পো ঃ

তুলসী মামা। সোঁদর বনের নতুন আবাদ থেকে বছরে কম করে দুবার আসতেন চাঙাড়ি চাঙাড়ি কাঁকড়া, হাঁড়ি হাঁড়ি ভাজা মাছ আর কাঁড়ি কাঁড়ি হরিণের মাংস নিয়ে। ভারি আমুদে আর ভারি গপ্পো বলিয়ে ছিলেন তিনি। এলেই আমরা ছোটরা ছেঁকে ধরতাম তাঁকে। যে ক'দিন থাকতেন সে ক'দিন পড়াশোনা মাথায় উঠতো, খেলাধুলায় ভাটা পড়তো, আর খাওয়া-দাওয়াও শিকেয় উঠতো। শুধু গপ্পো, আর গপ্পো—বাঘের গপ্পো, ঘড়িয়াল কুমীরদের গপ্পো, আর হরিণ শিকারের গপ্পো।

সেবার তুলসী মামা এলেন হরিণের মাংস না নিয়েই। শুধোলাম —মামা, এবার হরিণের মাংস আনলেন না যে বড়।

মৌচাকের মত মুখটাকে ঝুলিয়ে বিরস গলায় মামা বললেন—হরিণ শিকার ছেড়ে দিয়েছি রে!

—কেন মামা?

—আজ সেই গপ্পোই বলবো। না, না, গপ্পো নয়—একেবারে সত্যি ঘটনা।

—তাহলে আগে আগে যেসব গপ্পো বলেছো—সেগুলো সত্যি নয়?

মামা মুচকি-মুচকি হেসে শুধোলেন—কোন্ গপ্পো বল্ তো!

—সেই যে শীতের ভোরে আঁধার থাকতে থাকতে বলদ ভেবে বাঘ-গুলোকে ধরে এনেছিলে! দড়িতে বেঁধে বিচালি মাড়াচ্ছিলে! ফর্সা হতে অবাক হয়ে 'বাঘ' 'বাঘ' বলে চিৎকার করেছিলে? অমনি পটাপট দড়ি ছিঁড়ে বাঘগুলো বনের দিকে ভোঁ দৌড় দিয়েছিল!

মামার মুখটা হাসিতে ভরে গেল। বললেন—বনের বাঘকে কী যেখানে সেখানে দেখা যায়, না টেনে এনে বলদের মত বাঁধা যায়? ওরা হলো যাকে বলে সোঁদর বনের বাঘ। মানুষ-খেকো। গোপনে গোপনে চলাফেরা করে, গায়ের রঙ ঝোপের সাথে মিশিয়ে দিয়ে ঘাপটি মেরে শুয়ে থাকে, আবার গুঁড়ি মেরে মেরে শিকারের পেছনে পেছনে ধাওয়াও করে। পাঁচ হাত দূরে থাকলেও টেরটি পাওয়ার জো থাকে না। এরা কী তোদের কুকুর বেড়াল, না গরু ছাগল!

মনটা বেজায় খারাপ হয়ে গেল। মামার গপ্পো শুনে শুনে মনে হয়েছিল, সোঁদর বনের বাঘেরা দেশের গরু ছাগলের মত এখানে ওখানে পালে পালে ঘুরে বেড়ায়, ঘরের আনাচে কানাচে লুকিয়ে থাকে, আর শিকার দেখলে হালুম হুলুম করে লাফিয়ে পড়ে। মানুষ তাদের লাঠি পেটা করে, নদীর জলে নাকানি চোবানি খাওয়ায়, নয়ত চ্যালাকাঠ হাতে তাড়া করে। মামার তাহলে কোন্ কথাটা ঠিক? আজকের না আগের?

পুনরায় শুধোলাম—বাঘের গপ্পো না হয় মিছে হলো! মাছের গপ্পো? সেই যে বর্ষাকালে নদীর ধারে শনের খেতে শনফুল খেতে ডাঙায় উঠে আসে হাজার হাজার ভেটকি-বোয়াল, যাদের তুমি ধরে নিয়ে আসতে এখানে? তাদের বেলায়?

মামা বললেন—তাও মিছে কথা! কই-মাগুরের মত জিয়ল মাছ ছাড়া কেউ ডাঙায় উঠতে পারে না। শনফুলও ওরা খায় না।

—কেন উঠতে পারে না মামা?

জীবকে বাঁচতে হলে শ্বাস নিতে হয়। মাছ জলে বাস করে। নাক দিয়ে শ্বাস না নিয়ে ফুলকো দিয়ে জলের সাথে মিশে থাকা অক্সিজেনকে নিয়ে বেঁচে থাকে। ফুসফুস নেই তাদের—আছে ফুলকো। ডাঙায় থাকলে বাতাসের অক্সিজেনকে ওরা সরাসরি নিতে পারে না বলে মারা পড়ে।

—তাও না হয় হলো! তবে সেই যে বিরাট এক ঘড়িয়াল কুমীর—যাকে রাতে জাল ফেলতে গিয়ে ধরেছিলে, আর মাছ ভেবে কাঁধে তুলে নিয়ে এসেছিলে, তার বেলা?

এবারও মামা হাসলেন। বললেন—কুমীর কী আর মাছের মত রে! ওরা সরীসৃপ; মানুষ-খেকোও। চার চারটে পা। ইয়া বড়। সারা গায়ে কাঁটা। কার সাধ্যি ওকে কাঁধে তোলে। জল থেকে তুললে ওরা মাছের মত মরে যায় না। হামেশাই তারা ডাঙায় উঠতে পারে। এসব গাঁজা, বুঝলি, গাঁজা!

আমি কেঁদে ফেললাম। বললাম—তুমি কেন মিছে কথা বলেছিলে মামা! আমি যে তোমার সাথে বাঘ দেখতে বনে যাবো ভেবেছিলাম। আর ভেবেছিলাম ঘড়িয়ালদের নাকে দড়ি পরিয়ে টানতে টানতে দু-চারটেকে কলকাতা শহরে নিয়ে আসবো, শনের খেতে মাছ কুড়াবো, হরিণদের তাড়া করবো!

মামা দুঃখু পেলেন। বললেন—তোরা বাঘ-কুমীরের গপ্পো শুনতে

ভালবাসিস্, তাই বানিয়ে বানিয়ে বলতাম। আজ আর বানানো গপ্পো বলছি না। এ গপ্পো শুনলে তোরও কোনদিন হরিণ শিকারের ইচ্ছে হবে না।

—তাহলে দেরি নয়, এখনই গপ্পো শুরু করে দাও!

মামা হাত দিয়ে তাঁর বিরাট গোঁফ জোড়াটা ঠিক করতে করতে বললেন—তোদের এখানে আসবো বলে আমরা তিন শিকারী বন্দুক হাতে বনে গেলাম। উঁচু টিলার উপরে আছে একটা জলা। সেখানকার জল মিঠে, আর টিলার চারদিকে বড় বড় ঘাস। সাঁঝের সময় হরিণরা দল বেঁধে জল খেতে আসবে। তাই আমরা তিন শিকারী একটা গাছের মগডালে মাচা বেঁধে চুপচাপ বসে রইলাম।

বিকেলের দিকেই ঘাস খেতে এলো একপাল হরিণ। দলটা একবার একটা চক্কর দিয়ে শতদলের পাপড়ির মত, ছাতার শিকগুলোর মত, ছবিতে সূর্যের ছটাগুলোর মত, পেছনের পাগুলো একসাথে জুড়ে দিয়ে এবং মুখটা সামনের দিকে করে চরতে শুরু করে দিলে।

তৎপর হলাম তিনজনেই। নাগালের ভিতরে এলেই বন্দুকের ঘোড়া টিপবো। খতম করবো তিনতিনটেকে।

হরিণের দল কিছুতেই যখন কাছে এগিয়ে এলে না, তখন একটু উসখুস করলাম। ওরা আবার ভারি সজাগ। পাতা সরলেই তিং করে একবার লাফিয়ে উঠে, আর চোখের পলকে হাওয়া হয়ে যায়। তাই চুপচাপ বসে থাকতেই হলো।

একটু পরেই দেখলাম, জলার ধারে নল খাগড়ার মত বড় বড় ঘাসের ডগাগুলো একটু যেন নড়ে উঠলো। তাতেই কী যেন টের পেয়ে গেল হরিণের পাল। কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে পড়লো সবাই। বার দুই শ্বাস নিয়ে শূন্যে লাফ দিয়ে উঠলো। তারপর ছুট, ছুট, ছুট—বেদম ছুট। পলকের ভেতরেই গা ঢাকা দিলে বনে। শুধু পড়ে রইলো দুটো হরিণ শিশু। বেচারাদের বয়স কম বলে জোরে জোরে ছুটতে পারছিল না।

শিকার হাতছাড়া হয়ে যায় দেখে জলার ধার থেকে বেরিয়ে এলো একটা বাঘ। হরিণ শিশুদের কাছ থেকে মাত্র কয়েক লাফ দূরে যখন বাঘটা, তখনই ছুটে এলে মা হরিণটা। ছানাদের একটু শুঁকলে। বুঝিবা তাড়াতাড়ি বনে গা ঢাকা দিতে বললে।

বাঘ এবার মাত্র কয়েক গজ দূরে। বন থেকে ভেসে এলো হরিণদের

'কু' ডাক। হরিণ-শিশুরা সেই ডাককে অনুসরণ করে ছুটে গেল। আর বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়লো মা হরিণটার উপরে। তারপর হরিণটাকে পিঠে ফেলে জলার দিকে ছুটে গেল।

মামা একটু থামলেন। তারপর বললেন—চোখ আমাদের খুলে গেল, আর হরিণ শিকারের নেশাও কেটে গেল। চোখ মুছতে মুছতে তিনজনেই নেমে এলাম গাছ থেকে। একটা কথাও বলতে পারলাম না।

: বাঘের সাজা :

এক ছিল নদী। নাম তার মাতলি। মাতলির পরপারে নিবিড় বন—সোঁদর বন। আর এপারে কাঠুরিয়াদের বাস। কাঠুরিয়ারা নৌকো করে বনে যায়, কাঠ কাটে হোগলা-গোলপাতা বয়ে আনে, নয়ত মৌচাক ভেঙে কলসী কলসী মধু আনে।

সোঁদর বনে বাঘের বাস। ইয়া বড়, ইয়া গোঁফ জোড়া, ইয়া লেজ, যেমন গায়ে গতরে, তেমনই সাঁতারে পটু। ছুটতে পারে না বলে মানুষের দিকেই ওদের নজরটা বেশী। ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকে আর কাঠুরিয়াদের দেখলে পেছনে পেছনে চুপি চুপি ধাওয়া করে। কেউ একটু আনমনা হয়েছে কী, অমনি ঝুপ করে লাফিয়ে পড়ে ঘাড়ে।

সেবার কাঠ কাটতে গেলে পিকলুর বাবাকে ধরে নিয়ে গেল বাঘে। পিকলুর মা কাঁদলেন, বোন কাঁদলে, পড়শীরাও কাঁদলে। কাঁদলে না শুধু পিকলু। মায়ের চোখের জল মুছিয়ে দিতে দিতে বললে—তুমি কেঁদো না মা! আমি তো আছি। খাটবো, খুটবো, তোমাদের সবাইকে খাওয়াবো। আর বাঘগুলোকে উচিত সাজা দিয়ে আমার বাপকে মারার বদলা নেবো। তুমি দেখে নিও আর কাউকে কোনদিন বাঘে নিতে পারবে না।

এত দুঃখেও পিকলুর মা হাসলেন। কতই বা বয়স পিকলুর! এগার কী বারো। এই বয়সে তাকেই খাওয়াবার কথা। তাকে কী আর বনে পাঠানো যায়? পিকলুর মাথাটা কোলে নিয়ে অঝোরো কাঁদলেন পিকলুর মা।

তবু পিকলুকে কাঠ কাটতে বনে যেতে হলো। তাদের রোজগারের একটিই পথ—সেই বন। কাঠুরিয়ারা পিকলুকে আগলে রাখতো, হালকা কাজ দিতো, আর ভাগের বেলায় সমান সমান।

পিকলু সাহসী ছিল, সাবধানীও ছিল। কাদা পিচ্‌পিচ্‌ সরু পায়ে চলা পথে পাশের ঝোপের দিকে সাবধানী চোখ ফেলে ফেলে হাঁটতো। খস্‌ খস্‌ করলে কান খাড়া করতো, বোটকা বোটকা গন্ধ নাকে লাগলে কাঠুরিয়াদের সাবধান করিয়ে দিতো, বাঘের থাবার দাগ চোখে পড়লে সবাইকে দেখিয়ে দিতো।

কাঠুরিয়ারা অত শত কিছু করে না। তারা কেবল মন্তর আওড়াতে

আওড়াতে পথ হাঁটে। ভাবে, ঠিক মত মন্তর বলতে পারলে বাঘ পা চালাতে পারে না, হাঁ করতে পারে না, লাফ মারতেও পারে না।

মন্তরের ভরসা রাখে না একা পিকলু। ভরসা রাখবে কেমন করে? তার বাবাকে বাঘে নিয়ে গেছে, সেদিন আরও একটা অঘটন ঘটে গেছে। তার দলেরই একজনকে ধরে নিয়ে গেছে বাঘে। সে তো মন্তর বলতে বলতেই আসছিল! তাহলে?

দিন কয়েক বনে ঘুরতে ঘুরতে বাঘদের আস্তানাগুলোর হদিস পেয়ে গেল পিকলু। ভাবলে, ওদের একটু সাজা না দিলে নয়। হোক না কেন গায়ে গতরে বিশটা মানুষের সমান! তবু মানুষ-জীবটা যে বড় কম যায় না, সেটা ভাল করে জানিয়ে দিতে হবে ওদের।

পিকলু একবার শহরে গিয়েছিল। দেখেছিল, বন বন করে পাখাকে ঘুরতে। জেনেছিল—বিজলী দিয়ে পাখা চলে, কাউকে ঘোরাতে হয় না। তড়াক্ করে ঐ বিজলীর মতই মাথায় একটা মতলব খেলে গেল।

সেবার বর্ষার আগে এক বড় ঠিকাদার কাঠ ও মধু নেবে বলে একটা মোটা টাকার দাদন দিয়ে গেল। পিকলুও পেল বেশ কিছু টাকা। বর্ষায় বনে যাওয়া বারণ। সেই ফাঁকে পিকলু ছুটে গেল শহরে এক বিজলীর মিস্ত্রির দোকানে।

বুড়ো মিস্তির লোক ভাল। পিকলুকে কাজ শেখালে, আর পিকলুও বেজায় খাটুনি খাটলে। দু-চারদিনেই শিখে ফেললে অনেক কাজ। দোকানে লাভ হলো দুনো।

বুড়ো মিস্তির এমন মন দিয়ে আর কাউকে খাটতে দেখেনি। তার উপর পিকলু কোন মাহিনা নিত না। দুমাস পরে বুড়ো মিস্তির খুশি হয়ে বললে—পিকলু, তুমি আমার দোকানে থেকে যাও। আরও ভাল করে কাজ শিখলে তুমি নিজের পায়ে নিজে দাঁড়িয়ে যাবে। আমার মতো দোকান খুলে বসতে পারবে।

পিকলু বললে—ঠিকাদারকে কাঠ আর মধু এনে দেবো বলে দাদন নিয়েছি। অনেক টাকা! তার টাকা শোধ হয়ে গেলে ঠিক ফিরে আসবো। কাঠ-কাটার সময় এসে গেল, আমাকে বাড়ী যেতে হবে।

বুড়ো মিস্তির বেজায় দুঃখ পেলে। বললে—পিকলু, তুমি অনেক দিন কাজ করলে। যাই হোক কিছু নাও।

পিকলু বললে—না, পয়সা নয়, তুমি আমাকে ছোট্ট দেখে একটা ভ্যান রিক্সা বানিয়ে দাও, ঘাড় পর্যন্ত একটা ইস্পাতের টুপি দাও, গোটা

চারেক বার ভোল্টের ব্যাটারী দাও, আর এমন একটা পাখা দাও যার চারটে চওড়া ও বাঁকানো পাতের বদলে দু-দিকে ধারালো ইয়া লম্বা লম্বা চারটে ইস্পাতের ফলা থাকে। ডগাগুলোও যেন হয় ছুঁচালো। বিনি পয়সায় নেবোনা, এই নাও টাকা। কাজ হয়ে গেলে এগুলো আবার ফিরিয়েও দিয়ে যাবো।

বুড়ো মিস্তিরি পিকলুর কথা মত সব কিছুই তৈরি করে দিলে। আর সব কথা শুনে তারিফও করলে।

পিকলু বাড়ী এলে। পরদিন ভোরে নৌকা বেয়ে বনে পেঁছিলে এবং একাই বনের দিকে এগিয়ে গেলে রিক্সাতে চেপে। পেছনে ঘাড়ের কাছে খাড়া করে রাখলে পাখা। পাখা এমন বন বন করে ঘুরতে লাগলো যে, দূর থেকে তার ফলাগুলো চোখেই পড়লো না।

পিকলু দুপুরের দিকে এক কেঁদো বাঘের আস্তানার কাছাকাছি হলো। বাঘটা তখন ঝোপের তলায় ঘুমুচ্ছিল। এমন সময় মানুষের গন্ধ নাকে আসতে আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসলো। সামনে পিকলুকে কী একটা আজব জিনিসের উপর চেপে থাকতে দেখে রাগে দাঁত কিড়মিড় করে উঠল তার। পিকলুর উপর তার ভারি রাগ! দু-দুবার তার শিকার হাতছাড়া করেছে ঐ পিকলুই। আজ তাই একা দেখে লাফ মেরে তার ঘাড়ের উপর পড়লে।

পিকলু ভারি চালাক। বাঘের ভারে রিক্সা যাতে কাৎ হয়ে না পড়ে যায়—তার জন্য দুটো গাছে রিক্সাকে ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। বাঘটা লাফ দিতেই ইস্পাতের ধারালো পাতে মুখ গেল ফালা ফালা হয়ে, দাঁত গেল ভেঙে, আর শকও খেলে। ছিটকে পড়লে দূরে।

গোঁয়ার বাঘটা এবার রেগে গেল ভয়ানকভাবে। আবার ঝাঁপিয়ে পড়লে। এবার মুখটা তো বটেই, সামনের পা দুটোও কেটে গেল। খোঁড়া হয়ে গোঙাতে শুরু করলে এবার।

সেদিন পাঁচ পাঁচটা বাঘকে ঘায়েল করে ফিরে এল পিকলু। পরের দিন আরও পাঁচটা। পাঁচ পাঁচদিন ঘুরে ঘুরে সোঁদর বনের সব বাঘকে বুঝিয়ে দিলে, মানুষের ছেলের গায়ে জোর না থাকলেও মাথার জোর আছে।

সেই থেকে বাঘের ভয় দূর হলো। কাঠুরিয়ারা এন্তার শুরু করলে কাঠ কাটতে আর মৌচাক ভাঙতে। মন্তর যা পারে নি, যন্তর তা পারলে। কাঠুরিয়ারা এবার মন্তর ছেড়ে যন্তরই ধরলে।

ঃ আঁধারে আলো ঃ

সাঁঝের সময় লোডশেডিং। আলো জ্বালিয়ে মা ঘরের কাজে রত। খোকন সোনা মায়ের চোখকে ফাঁকি দিয়ে গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে গেল সামনের আম-কাঁঠালের বাগানটার দিকে। চারদিক থেকে ঝিন্ ঝিন্ রব তুলছে সিকাডারা, কট্ কট্ করছে গেছো ব্যাঙরা, আর ঝোপে ঝাড়ে সবে আলো জ্বালাতে শুরু করেছে জোনাকিরা।

খোকার অবাক লাগে ঐ জোনাকিদের দেখলে! সাত-তাড়াতাড়ি ঝোপের দিকে এগিয়ে গিয়ে জোনাকিদের শুধোলে—

দীপ জ্বালাও জোনাকি গো,
আগুন কোথা পেলে?

জোনাকিরা বললে—

বুকের তলায় লুসিফেরিন
জ্বলছে অবহেলে।

খোকা বললে—তোমরা এসো আমার ঘরে। খাবে, দাবে আর লোডশেডিং হলে আলো জ্বালাবে। বিজলীর আলো চলে গেলে মায়ের ভারি কষ্ট হয়।

জোনাকিরা হাসলে। বললে—আমাদের এ আলোতে তাপ নেই, আলোও নেই।—একেবারে শীতল। লাখ লাখ জোনাকিকে পুষলেও তোমাদের একটা ঘর আলোকিত হবে না। তাছাড়া আমাদের লুসিফেরিনের আলোতে তোমাদের চোখে কোন রঙ ধরা পড়বে না। সবকিছু বিচ্ছিরি ঠেকবে। তার চেয়ে ঝোপের ওপারে বনবেড়ালের বাসায় যাও। ওর চোখের আলো খুব জোরালো।

খোকন বনবেড়ালের কাছে গেল। বনবেড়াল তখন ঘুম থেকে উঠে শিকারে যাওয়ার মতলব করছিল। খোকন বললে,

বনে থাকো বনবেড়াল
এসো আমার ঘরে,
লোডশেডিং-এ আলো দেবে
থাকবে মজা করে।

বনবেড়াল মুখটা ঘোরালে খোকনের দিকে, অমনি তার দু-চোখে দুটো নীল নীল আলো দপ্ দপ্ করে ফুটে উঠলো। দুখানা নীল আগুনের টুকরো দেখে ভয় পেলে খোকন।

বনবেড়াল বার দুই হাইতুলে বললে—অমন আলো তোমাদের ঘরে মেনি বেড়ালটারও আছে। গরুর চোখেও পাবে, আঁধারে যারা ভালভাবে দেখতে পায়, তাদের সবার চোখে আছে। এতে আমরাই দেখতে পাই, তোমরা দেখতে পাবে না।

—কেন? শুধোলে খোকন।

বনবেড়াল বললে—শোন তাহলে। আঁধারে ভালভাবে দেখতে গেলে চোখে খুব বেশী পরিমাণে বড় কোষ থাকা চাই। তার উপর আমাদের চোখের পেছনে থাকে একটা বিশেষ পর্দা। তার উপাদান লুমিনাস টেপেটাস। অতি মৃদু আলোও আমাদের চোখে অপচয় হতে পারে না। তাই আমরাই কেবল দেখতে পাই। আর তোমরা ঐ পর্দাটাকে জ্বল জ্বল করতে দেখো।

খোকন মিনতির সুরে বললে—তুমি দাও না অমন গুটি কয়েক লুমিনাস টেপেটাসের পর্দা আর কিছু বড় কোষ! আমার আর আমার মায়ের চোখে ঝুলিয়ে দেবো। তাহলে লোডশেডিংয়ের সময় কোন অসুবিধা হবে না।

বনবেড়ালটা হাসলে। বললে—ওতো আমাদের চোখে আপনা হতেই গজায়। দেবো কেমন করে?

খোকন ভাবলে মনে মনে। এক সময় বললে—আমি বড় হলে তোমাদের চোখ নিয়ে গবেষণা করবো। লুমিনাস টেপেটাসের পর্দা তৈরি করে আমার আর মায়ের চোখের ভেতরে পেছন দিকটায় পরিয়ে দেবো। রাতে তাহলে বিজলী বাতির কোন দরকার হবে না, কী বল?

বনবেড়াল বললে—তোমরা মানুষরা তো অনেক কিছুই করছো? এ আর এমন কী কঠিন কাজ! কাজে লেগে পড় ঠিক পারবে।

ঠিক সেই সময় মায়ের গলা শুনতে পেলে খোকন। মা যেন ভয় পেয়েছে বলে মনে হলো খোকনের। ডাকছেন—খোকন, খোকন, কোথায় গেলি, ফিরে আয়—ফিরে আয়!

খোকন আর একটুও দেরি করলে না। জোরে জোরে পা চালালে ঘরের দিকে।

মা দেখতে পেয়ে ছুটে এলেন। খোকাকে কোলে তুলে নিয়ে, গালে আলতোভাবে একটা চড় মেরে বললেন—কোথায় গিয়েছিলি! দুষ্টু কোথাকার!

খোকন বললে—আঁধারে আলো খুঁজতে!

ঃ খুকু ও হলুদ বসন পাখী ঃ

খুকুদের বাড়ীর পেছনে তেঁতুল আর বকুলের ডালে ডালে লাফাতো দুটো হলুদবসন পাখী। লাল লাল ঠোঁট—যেন আলতায় রাঙানো, হলুদ পাখার তলায় কালো কালো ডোরা—পরনে যেন কালোপেড়ে বাসন্তী রঙের শাড়ী, মাথার তলায় কালোর ছোপ—যেন এক ঢাল কালো চুল, থেকে থেকে করুণ সুরে ডাক দেয়—"কৃষ্ণ গোকুল"! "কৃষ্ণ গোকুল"! যেন গোকুলের কৃষ্ণ ছাড়া ওদের মুখে কথা নেই।

বৈশাখ মাস। আগুন ঝরা মাস। গাছগাছালিরও পাতা ঝরাবার সময়। পেয়ারা, বকুল—সব গাছেরই রাশি রাশি হলদে পাতা। হলুদ বসন পাখী দুটো সারাটা দিন এখানে ওখানে লাফায়, আর সাঁঝের বেলায় খুকুদের খিড়কির বাগানে—পুকুর ঘাটের একেবারে পাশে, পেয়ারা গাছটার চওড়া চওড়া হলদে পাতার ফাঁকে গায়ের রঙটাকে মিশিয়ে দিয়ে বসে থাকে। তখন ভুলেও কৃষ্ণনাম আনে না মুখে। পা গুটিয়ে, কুঁজো হয়ে পালক ফুলিয়ে, পিঠে ঠোঁটটি গুঁজে এবং লেজটাকে পাতার উপর পেতে দিয়ে যখন ঘুমিয়ে থাকে,—তখন খুকুর ঐ ডাগর ডাগর চোখ দুটোও ধরতে পারে না—কোনটা পাখী আর কোনটা পাকা পাতা। পারে না আঁধারে যারা সবচেয়ে ভাল দেখতে পায়—সেইসব হুমহুমো এবং হুতোমরা। সবার চোখে ধাঁধাঁ লাগিয়ে দেয়। শ'য়ে শ'য়ে হলদে পাতার ফাঁকে মিলেমিশে একেবারে একাকার হয়ে থাকে।

খুকুমনি রাতে পুকুরঘাটে গেলে ওদের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। ওড়ায় না। মায়ের বারণ।

মা বলেন, ওরা মানুষের সেরা মানুষ ছিল, দেবতার বাড়া মন ছিল, গোকুলের কৃষ্ণ ও রাধার সখা ও সখী ছিল। কৃষ্ণ একদিন গোকুল ছেড়ে সেই যে মথুরায় চলে গেলেন, আর ফিরলেন না। গোকুলের ছেলেমেয়ে থেকে বুড়োবুড়ি সবাই কেঁদে কেঁদে সারা হলেন, রাধা অন্ন-জল ছেড়ে নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে কেবলই হা-হুতাশ করতে লাগলেন, মা যশোদা মাটিতে মাথা ঠুকতে লাগলেন। রাধার দুঃখ দেখে ওঁরা থাকতে পারলেন না। কৃষ্ণকে বলে কয়ে গোকুলে ফিরিয়ে আনতে দুজনে মথুরার দিকে পা বাড়ালেন।

মথুরার পথ তাঁরা কেউ চিনতেন না। হারিয়ে ফেললেন পথ। বছরের

পর বছর কেবল পথের গোলকধাঁধাঁয় ঘুরে বেড়ালেন। ততদিনে তাঁরা ঘর ভুলেছেন, গোপ-গোপীদের ভুলেছেন, রাধাকেও ভুলেছেন। মুখে শুধু একটি কথা—"কৃষ্ণ গোকুল"! "কৃষ্ণ গোকুল"! কেউ তাঁদের নামের কথা শুধোলে উত্তর দেন "কৃষ্ণ গোকুল", ঠিকানার কথা শুধোলে বলেন "কৃষ্ণ গোকুল", এমন কি বাপ-মায়ের কথা শুধোলেও বলেন 'কৃষ্ণ-গোকুল'। সবাই ভাবে পাগল।

ঘুরতে ঘুরতে একদিন পথের মাঝেই তাঁরা পাতলেন শেষ বিছানা। ঠিক তখনই ঠাকুরের দয়া হলো। শেষ সময়ে শেষ বারের মত কেষ্ট ঠাকুর তাদের দেখা দিয়ে বললেন, "তোমরা দুজনে পাখী হয়ে আকাশে উড়ে যাও, আর জগৎকে শোনাও কৃষ্ণনাম।"

খুকুমণি যখনই ওদের গলায় 'কৃষ্ণ-গোকুল' শোনে, তখনই তার মনে পড়ে যায় মায়ের গপ্পের কথা। দুঃখুও হয় তার। ভাবে—আহা বেচারা! তেঁতুল বকুলের ডালে ওদের লাফাতে দেখলে খুকুমনি ছড়া কেটে কেটে ডাকে—

মায়ের ঘরে কেষ্ট ঠাকুর, কষ্ট কেন পাও
কেষ্ট পাবে, রাধাও পাবে, মায়ের ঘরে যাও।
চাল কলাই ভাজা দেবো,
মণ্ডা মেঠাই খাজা দেবো,
মনের সুখে খাও।
মায়ের সুরে সুর মিলিয়ে কৃষ্ণ-গোকুল গাও
মায়ের ঘরে যাও।

বৈশাখ শেষ হলো। খুকুমনি একদিন দেখলে, বকুলের ঘন পাতার আড়ালে কবে যেন বাসা বানিয়েছে এরা। দু-দুটো ছানা। কিচকিচ করছে সব সময়। মা-বাবা দুজনে ঠোঁটে ফড়িং গুঁজে ছুটে যায় আর ছানাদের খাওয়ায়।

খুকুমনির ভারি লোভ হলো। মেলা থেকে একটা বড় গোছের খাঁচা কিনলে, জল দেওয়ার বাটি কিনলে, খাবার দিতে ছোট্টো একটা রেকাবও কিনলে। তারপর পাড়ার ডানপিটে ছেলে হাবুলকে বলে কয়ে ছানা দুটোকে পেড়ে আনলে।

মা বকলেন। খুকুমনি ঠোঁট ফুলিয়ে মায়ের বকুনি হজম করে বললে—আমি ওদের পালবো। একটুও দুঃখু পেতে দেবো না।

খাঁচায় এসে ছানাদুটো কিছুছু খেলে না। রাজ্যের যত ভাল

খাবারেও মন ওঠে না। এমনকি ফড়িংও ছোঁয় না। শুধু ভেতরে ডানা ঝাপটায় আর কিচ্‌কিচ্‌ করে।

এদিকে ছানাদুটোর মা-বাবা যখন তখন মুখে ফড়িং নিয়ে ঘরের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়ায় আর কিচির মিচির করে। ছানাদুটো যেন মা-বাপের গলা টের পায়। অমনি জুড়ে দেয় ডানা ঝাপটানো।

মা বকাঝকা শুরু করলেন। বললেন—হাব্‌লাকে ডেকে ওদের বাসায় ছেড়ে এসো গে! না খেয়ে মারা পড়বে।

খুকুমনি এবার বুঝলে, কাজটা সে ভাল করেনি। হাবুলকে খুঁজলে, দেখা পেলে না। খাঁচার বাহিরে ছানা দুটোকে ছেড়ে দিলে, উড়তে পারলে না। বেজায় দুঃখু পেলে খুকুমনি। হুলো বেড়ালটার ভয়ে, দিনে দাঁড়াশ আর রাতে তিতিরের ভয়ে, রাতে পেঁচা আর খাটাশদের ভয়ে, পুনরায় ওদের খাঁচায় পুরলে। মায়ের কথা মতো পেছনের পেয়ারা গাছটার ডালে ঝুলিয়ে রাখলে খাঁচাটা।

ছানাদের খাওয়ানোর ভার তাদের মা-বাবাই নিলে। দিনে দশবার ফড়িং নিয়ে ওরা ছুটে আসে আর খাঁচার ফাঁক দিয়ে ওদের মুখে গুঁজে দেয়।

ওদের মা-বাবা না থাকলে খুকুমনি যায় খাঁচার কাছে। ফড়িং ধরে দিলে দু-চারটে খায়। চাল-কলা খায় না। খুকুমনি বুঝতে পারলে মুখে কেষ্ট কেষ্ট করে বটে, মনে পোষে দারুণ হিংসে।

আষাঢ় এলো, বাদল নামলো। ছানা দুটোর মা-বাবাকে আর দেখা গেল না। বুঝিবা এদেশে ছেড়ে অন্যদেশে কেষ্ট ঠাকুরকে খুঁজতে গেল। মায়া নেই, মমতা নেই, ছানাদের ছেড়েও চলে গেল। পথকে সার করে কেবল দুদিনের অতিথি হয়ে এসেছিল যেন।

খাঁচার ভেতরে এবার পাকাপাকিভাবে বাঁধা পড়লো ছানা দুটো। খায়, দায়, খুকুমনিকে দেখলে কিচির মিচির চিৎকার জুড়ে দেয়। শুধু খেতে চায়, একবারও 'কৃষ্ণ গোকুল' বলে না।

খুকুমণি দিন গুনতি করে। কবে পাখী দুটো 'কৃষ্ণ গোকুল' বলবে! না, বছর ঘুরে এলো, তবুও না।

মাঘ গেল, ফাগুন এলো। গাছে গাছে রঙ ধরলো। আর তখনই খুকুদের পেছনের বাগানে কোথা থেকে ছুটে এলো আগের মত জোড়ায় জোড়ায় হলুদ বসন পাখী। 'কৃষ্ণ গোকুল' ডাকে চারদিক ভরে গেল। তবু খাঁচার পাখী দুটো একবারও ডাকলে না 'কৃষ্ণ-গোকুল'। শুধু

অপরের ডাক শুনলে ঘাড় সোজা করে শোনে আর ডানা ঝাপটাতে থাকে।

খুকুমনি ভাবলে, পাখী দুটো বোবা। নয়ত বনের পাখী খাঁচায় বাঁধা পড়ে গান ভুলে গেছে।

কী ভেবে খুকুমনি একদিন পাখী দুটোকে খাঁচা থেকে বার করে ছেড়ে দিলে।

পাখী দুটো সহজে উড়তে পারলে না। অনেক কসরত করে শেষে উড়ে গিয়ে বসলে পেয়ারা গাছের ডালে। তবে ফিরেও এলো। ধরা দিল খুকুমনির হাতে। খুকুমনি খাওয়ালে। বাঁধলে না।

সেদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে খুকুমনি ছুটলো পাখী দুটোর খোঁজে। দেখলে অবাক কাণ্ড! খাঁচার উপর লাফাচ্ছে একটা পাখী। আর চিৎকার করছে 'কৃষ্ণ গোকুল', 'কৃষ্ণ গোকুল'।

খুকুমনি তার সাথীটিকে খুঁজলে। এক সময় চোখে পড়লো, তেঁতুলের ডালে একটা ফড়িং ঠোঁটে গুঁজে বসে আছে সাথীটি। খাওয়া শেষে সেও ডাক দিলে 'কৃষ্ণ গোকুল', 'কৃষ্ণ গোকুল'।

খুশিতে উপচে পড়লে খুকুমনি! ভাবলে, এবার দুটিতে খেতে এলে খাঁচায় ঢুকিয়ে দেবে। দৈনিক ডাক দেবে 'কৃষ্ণ গোকুল-'কৃষ্ণ গোকুল'।

না, পাখী আর ধরা দিলে না। ভুলে গেল খুকুমনিকে। খুকুমনি দুঃখু পেলে বটে, তবু কেমন যেন একটা অজানা খুশির আমেজে মনটা তার থেকে থেকে শিউরে উঠতে লাগলো।

: খোকার বায়না :

উঠানে সবুজ সবুজ ঘাসের ভেতরে সবুজ ওড়না গায়ে গঙ্গা ফড়িংরা পা গুটিয়ে আর জিরাফের মত ইয়া বড় গলাটাকে বাইরে রেখে বসে থাকে চুপচাপ। খোকনের ভারি লোভ। কম করে একটাকে সে পাকড়াও করে!

খোকন পা চেপে চেপে এগিয়ে গেলে ধরতে। অমনি গঙ্গা ফড়িংটা তিড়িং করে লাফ দিয়ে দু-হাত দূরে সরে গেল। মুখখানা ভার ভার করে খোকন শুধালে—

গঙ্গা ফড়িং গঙ্গা ফড়িং
করছো তুমি কী?

গঙ্গা ফড়িংটা গলা নামিয়ে চুপিসাড়ে বললে—চুপ, চুপ!

মাথার ভেতর কম্প্যুটার
শিকারে বসেছি।

খোকন শুধালে—কম্প্যুটার আবার কী?

গঙ্গা ফড়িং বললে—ওহো, তুমি তো জানো না। তোমাদের মানুষের বানানো এক যন্তরের নাম। যত সব কঠিন কঠিন অঙ্ক নিমেষে কষে দিতে পারে। আর আমাদের মাথায় যন্তরটা আপনিই গজায়। তাইতো শিকার চোখে পড়লে যন্তরটা আপনিই জানিয়ে দেয়—কত দূরে শিকার আর কত জোরে লাফাতে হবে! নিশানা পেলে অমনি লাফিয়ে পড়ি, আর শিকারকে পাকড়াও করে ফেলি।

খোকন বললে—এত কষ্ট কেন বাপু! আমার সাথে এসো। রাঙী গাইর দুধ দেবো, আম কাঁঠালের জেলি দেবো, মায়ের হাতের মোয়া দেবো, সাদা তুলতুল বিছানা দেবো। খাবে দাবে ঘুমাবে, আর আমার সাথে খেলা করবে।

গঙ্গা ফড়িং বললে—না ভাই, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বিছছিরি বিছছিরি পোকামাকড় চিবিয়েও সুখ আছে। পরের ঘরে দুধ কলায় কাজ নেই। তবে হ্যাঁ, খেলার সাথী যদি চাও, তাহলে তোমাদের বাগানে ঐ শিরীষ গাছটার কাছে যাও। দেখবে অনেক বাদুড় ঝুলছে। ওরা দিনের বেলায় দেখতে পায় না, রাতেও ভাল দেখে না। এমন খাবারের খোঁজ পেলে তাদের কেউ না কেউ রাজি হতে পারে।

খোকন খুশি হলো। ছুটে গেল শিরীষের তলায়। দেখলে—হুকে ঝোলানো কালো কালো রুমালের মত হাজার হাজার বাদুড় ঝুলছে শিরীষের ডালে ডালে। খোকন তাদের ডাকলে—

আদুড় বাদুড় আয়
ডাকছে আমার মায়।
ক্যাচর-ম্যাচর ফল ফলারে ;
তাল সুপুরি ভারে ভারে ;
খাবি দাবি সারা বেলা
আমার সাথে করবি খেলা।

পিট পিট করে তাকালে বাদুড়রা। তলার দিকে যে বুড়ো বাদুড়টা ঝুলছিল, সেইই বললে—পেট ভরাতে পরের দোরে বাঁধা পড়ি না আমরা। সারারাত গতর খাটাই, আর দিনের বেলায় বাসায় এসে মজা করে ঘুমাই।

খোকন বললে—গঙ্গা ফড়িংয়ের মুখে যে শুনলাম—

আঁধার রাতের দিক নিশানায় কষ্ট তোমার ভারি ?

বুড়ো বাদুড় বললে—ও কিচ্ছু জানে না।

সুপার সনিক ছড়িয়ে মোরা দিক নিশানা করি।

—সুপার সনিক, সুপার সনিক, সেটি আবার কী ?

—ধার করে যে রাডার বানাও—তাও জানো না কী ?

খোকন বললে—না, জানি না।

বাদুড় বললে—তাহলে শোন ! আমরা ডানা কাঁপাতে থাকলে এক ধরনের শব্দ বার হয়। সে শব্দ দূরে-বহু দূরে কোন কিছুতে বাধা পেয়ে ফিরে এলে ধরা পড়ে আমাদের কানে। তোমাদের কান তা পারে না। তাই নকল করে বানিয়েছ তোমরা রাডার।

অবাক হলো খোকন। শুধোলে—অনেক-অনেক দূরের খবর তুমি এনে দিতে পারো ?

—পারি বৈকি ?

—তাহলে বলতো, আমার বাবা অফিস থেকে ফিরেছে কি না, আর কত দূরে আছে ?

বার দুই পাখা ঝাপটিয়ে বাদুড়টা বললে—তোমার বাবা ঐ আসছে। মিনিট পাঁচেকের ভেতরে ঘরে ঢুকবে।

খোকন বাড়ী ছুটে গেলে। হিসেব করে দেখলে, ঠিক পাঁচ মিনিট

গত হতেই তার বাবা এসে ঢুকলেন ঘরে। খোকন বাবাকে জড়িয়ে ধরে বললে—আমি আগে থেকে টের পেয়ে গেছি, তুমি এখ্খুনি আসবে।

বাবা অবাক হলেন। শুধোলেন—কেমন করে?

খোকন বললে—ঐ জ্যান্ত রাডার বাদুড়ের কাছ থেকে। তুমি একটা রাডার কিনে দাও না বাবা! ঘরে বসে সব খবর পাবো, পলকের ভেতরে অনেক দূরের খবর জেনে নেবো, ভারি মজা হবে!

বাবা হাসলেন।

মুখ গোমড়া করে খোকন বললে—কালকেই এনে দাও। তা না হলে আমি দুধ খাব না।
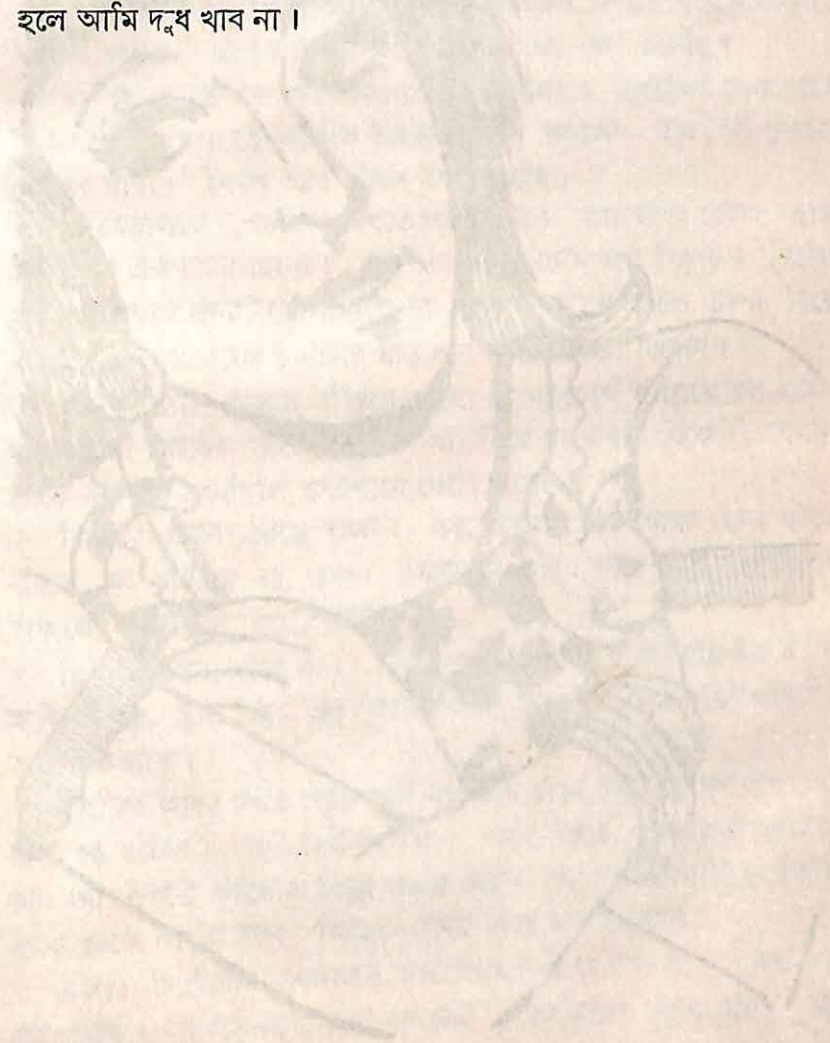
: পিংকি :

ইস্কুল থেকে ফেরার পথে রিংকি দেখলে, আলের পাশে শুকনো ঘাসের ভেতরে মিউ মিউ করছে একটা বিড়ালছানা। ধবধবে সাদা, মাথায় ও পিঠে কালো কালো ছোপ।

গোল গোল চোখে থমকে দাঁড়ালো রিংকি। তারপর এক বগলে বই, আর এক বগলে বেড়াল ছানাটাকে গুঁজে একরকম নাচতে নাচতে বাড়ীতে হাজির হলো। মা-কে বললে—দ্যাখ, দ্যাখ, মা—কী এনেছি!

মা ঘরের ভেতরে কী কাজ যেন করছিলেন। মিউমিউ ডাক শুনে পেছন ফিরে তাকাতেই আঁতকে উঠলেন যেন। বললেন—ইস্, কী নোংরা মেয়েরে বাবা! ফেলে আয়, ফেলে আয়, বলছি!

মা বেড়ালকে দু-চোখে দেখতে পারেন না। তার উপর রোগা, হাড় জিরজিরে এক বেড়ালছানা। গা ভরা উকুন, চোখ ভরা পিচুটি। রিংকি যখন কিছুতেই ছানাটাকে নামালে না, তখন মা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বাঁ হাতের দু আঙুলে ছানাটার ঘাড় ধরে উঠানে ফেলে দিলেন।

রিংকি ঠোঁট ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। দু-চোখ ছাপিয়ে জল এলো তার। মা ঝাঁঝের সুরে বললেন—যা, নিয়ে যা এখান থেকে। যেখান থেকে কুড়িয়ে এনেছিলি, সেইখানে ফেলে আসবি।

রিংকির মনটা ভেঙে গেল। তবু বেড়াল ছানাটাকে হাত ছাড়া করতে মন চাইলো না তার। খেলাঘরে হাঁটু সমান উঁচু মুখখোলা বাক্সের ভেতরে লুকিয়ে রাখলো।

মিউ মিউ তবু থামে না। রিংকি কী ভেবে মাকে লুকিয়ে এক মুঠি মুড়ি দিলে, চুরি করে এক টুকরো ভাজা মাছও। এবার যেন থামলো মিউ মিউ ডাক।

রিংকির আদর পেয়ে পেয়ে আর মাছ-দুধ খেয়ে খেয়ে বেড়াল ছানাটার গায়ে রঙ ধরলো। মিউ মিউ করে না। বরং ধরতে গেলে লেজ ফুলিয়ে ফ্যা ফ্যা করতে করতে লুকিয়ে পড়তে চায়। আরও মজা পায় রিংকি। ডাকে তাকে পিংকি বলে—নিজের নামের সাথে নাম মিলিয়ে।

এরপর পিংকিকে খেলাঘরে আর আটকে রাখা গেল না। বেশ বড় সড় হয়েছে। নাদুস-নুদুস। দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে হয়। মা

প্রথম থেকেই জানতেন, রিংকি বেড়ালছানাটাকে ছেড়ে আসেনি। মাঝে মাঝে বকাঝকা করতেন বটে, তবু রিংকির খেলাঘরের রাজারানী—বড় বউ থেকে হাজার রকমের জানোয়ারের সঙ্গে জ্যান্ত বেড়ালছানাটা বেমানান হলেও মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু খেলাঘর ছেড়ে পিংকি যখন রান্নাঘরে ঠাঁই করে নিলে তখন মা আর কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারলেন না। এটা-ওটায় মুখ দেয়, ঢাকা খুলে মাছটা সরায়, এমনকি গরম দুধে পা ডুবিয়ে পা চাটতে শুরু করে। একেবারে অসহ্য।

মা রাগ করেন, বকাঝকা করেন, পিংকিকে মারতেও এগিয়ে যান।

বেজায় চালাক পিংকি। এমনিতে ভালো মানুষ। কাউকে রাগ করতে দেখলে, তেড়ে আসতে দেখলে, কারও হাতে লাঠি দেখলে এমনভাবে লুকিয়ে পড়ে যে, হাজার খোঁজাখুঁজিতেও হদিস পাওয়া যায় না।

মা দেখলেন, পিংকিকে না তাড়ালে নয়। রিংকি পড়তে গেলে পাড়ার দস্যি ছেলে লালুকে দিয়ে পিংকিকে পাঠিয়ে দিলেন নদীর ধারে জেলেদের মাছ ধরার ঘাঁটিতে।

বিকেলে ইস্কুল থেকে এসে রিংকি পিংকিকে খুঁজলে। দেখতে না পেয়ে মাকে শুধোলে—মা, আমার পিংকি!

মা রেগে বললেন—লালু ওকে যমের বাড়ীতে ছেড়ে এসেছে।

রিংকি যম নামের কাউকে চেনে না। শুধু মায়ের মুখে মাঝে মাঝে নামটা শোনে। পা দুটো কচলাতে কচলাতে রিংকি বললে—তুমি কেন ওকে যমের বাড়ী দিতে গেলে! এনে দাও, আমি ওকে নিয়ে খেলা করবো।

মা ঝাঁঝের সঙ্গে বললেন—তোর খেলাঘরে অনেক পুতুল বেড়াল আছে, তাদের নিয়ে খেলা করবি।

রিংকি বললে—ওরা যে হাঁটে না, খায় না, মিউ মিউ করে না। শুধু টিপলে প্যাঁক প্যাঁক করে। ওদের নিয়ে তুমি খেলা কর গে! আমি পিংকিকে নেব।

রিংকি আর দাঁড়ালে না। ছুটে গেল লালুর বাড়ীতে। লালুকে না পেয়ে বাড়ী এসে মাকে জড়িয়ে ধরে বললে—মা, তুমি যমের বাড়ীটা কোথায়—একবার বলে দাও না! আমি এক্ষুনি নিয়ে আসবো পিংকিকে।

মা কিছুই বললেন না। পিংকিকে পাঠিয়ে দেওয়ার পর থেকে তাঁর

নিজেরই কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছে। দুধের ঢাকা কেউ খুলছে না, খাওয়ার পাশে কেউ ঘুরঘুর করছে না, চালার উপর মসমস করে কেউ হাঁটছে না, মিউ মিউও কেউ করছে না। ঐ টুকুন ছানাটা ঘরটাকে যেন সবসময় উথাল-পাথাল করে ছাড়তো। একবেলার ভেতরে কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছে বাড়ীটা।

রিংকি খুব করে কাঁদলে। রাতে খেলে না। কাঁদতে কাঁদতেই ঘুমিয়ে পড়লে। ভোর হতেই ছুটলে লালুদের বাড়ীতে।

লালু তখন বিছানা থেকে উঠে পায়চারি করছিল। রিংকি তাকে শুধালে—আচ্ছা লালুদা, যমের বাড়ীটা কোনদিকে একবার দেখিয়ে দিতে পারো!

লালু হাঁ করে তাকিয়ে রইলো রিংকির দিকে। এক সময় বললে—তোর যমের বাড়ীতে যেতে সাধ হয়েছে বুঝি?

রিংকি মুখ ভার করে বললে—হ্যাঁ। মা বললে, তুমি নাকি পিংকিকে যমের বাড়ীতে ছেড়ে এসেছো! আমি নিয়ে আসবো তাকে।

লালু হো হো করে হেসে উঠলে। হাসি থামিয়ে বললে—সে-অনেক দূর! তাছাড়া যমের বাড়ী থেকে কাউকে ফিরিয়ে আনা যায় না, বুঝলি?

ঠোঁট ফুলিয়ে রিংকি বললে—যমকে ঠিক বলে কয়ে আমি ফিরিয়ে আনবো লালুদা, তুমি দেখে নিও!

হেসে লালু বললে—যমকে যা দেওয়া হয়, তা ফিরে আসে না। তুই বরং বাড়ী যা, আর একটা পিংকি এনে দেবো তোকে!

—না, লালুদা! পিংকিকেই চাই। কাল থেকে পিংকি হয়ত কত কাঁদছে, কত মিউ মিউ করছে! তুমি একবার যাও না লালুদা!

রিংকির মুখের দিকে তাকাতে এতবড় ডানপিটে যে লালু—তারও কেমন যেন মায়া হলো। আসল কথাটা খুলে বলতে পারলে না সে। রিংকিকে নিরস্ত করতে বললে—যমের কাছ থেকে ফিরিয়ে আনতে গেলে অনেক টাকা লাগবে, বুঝলি! এত টাকা পাওয়া যাবে না।

রিংকি কি যে ভাবলে মনে মনে। তারপর তার গলা থেকে হার ছড়াটা খুলে লালুর হাতে দিয়ে বললে—লালুদা, যমকে ঐ হারটাই দিও। যমকে বলো, রিংকির টাকা নেই। হারের বদলে যেন পিংকিকে ফিরিয়ে দেয়!

লালু বোবা হয়ে গেল। লালু জানে, হারটা রিংকির বুকের

আধখানার মত। একটা তুচ্ছ বেড়ালছানার জন্য সে বিলিয়ে দিতে চাইছে! হারটা পিংকির গলায় পরিয়ে দিয়ে লালু বললে—তুই ঘরে যা, পিংকিকে ফিরিয়ে আনতে আমি এখনই যাবো।

রিংকি খুশি হয়ে চলে গেল। আর আকাশ পাতাল ভাবতে লাগলে লালু। সে গতকাল পিংকির গলায় ইট বেঁধে ফেলে এসেছে নদীতে। এই প্রথম তার মনে হলো, কাজটা সে ভাল করে নি। এতখানি নিষ্ঠুর না হলেও চলতো।
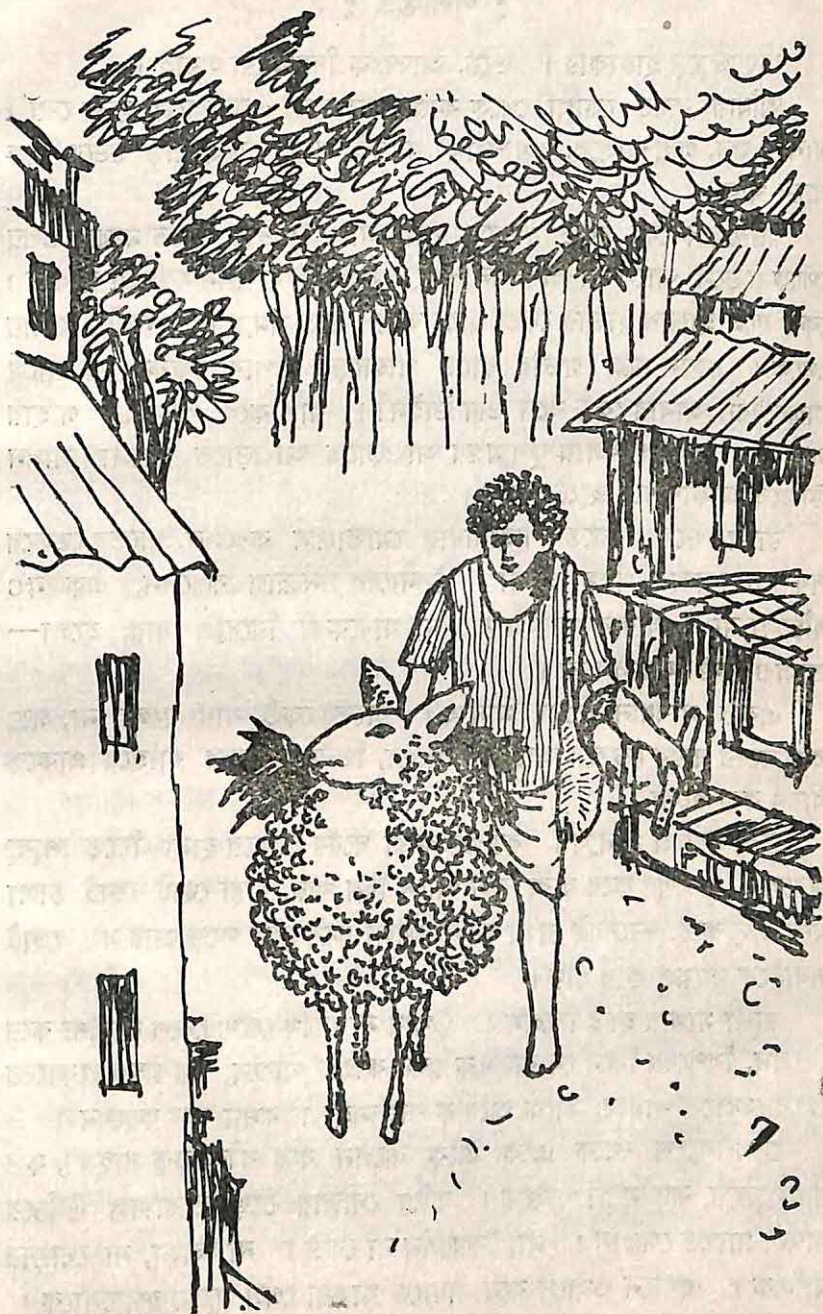
: পলাতক :

রাজ্যজুড়ে হাহাকার। ভয়ে, আতঙ্কে দিশেহারা সবাই।

আঁধার রাতে কোথা থেকে কারা যেন ছুটে এসে রাজ্যে হানা দেয়। মানুষ-জন, গরু-বাছুর, পশু-পাখী যাকেই পায়, তারই ঘাড় ভেঙে রক্ত শুষে খায়।

রক্ত-খেকোদের কেউ দেখতে পায় না। গভীর রাতে মাথার উপর থেকে ভেসে আসে সাঁ-সাঁ—শন্‌-শন্‌ আওয়াজ। যেন ঝোড়ো হাওয়া। কেউ বলে হাজার হাজার দৈত্য ছুটে আসে সাত সমুদ্র তের নদীর ওপার থেকে। কেউ বলে গভীর রাতে পাহাড়ের ওপার থেকে ছুটে আসে রাক্ষসীরা, আবার কেউ বলে ওরা ডাইনী। বাস করে পাহাড়ের গুহায় গুহায়। রাতের বেলায় ফুস্‌মন্তর আওড়াতে আওড়াতে কালো আসন উড়িয়ে আকাশপথে ছুটে আসে।

রাজা ওদের ধরতে পাহারাদার মোতায়েন করলেন, রাতের ভেতরে সব পাহারাদার খতম হলো। সৈন্যদের নিয়োগ করলেন, একজনও বাঁচলো না। যাদুকরদের পাঠালেন, যাদুকরী বিদ্যেও সারা হলো—তারাও কেউ ফিরলেন না।

এবার সাবধান হলো মানুষ। রাতে কেউ বার হলো না, গরু বাছুরদের ঘরের ভেতরে আটকে রাখলো, ভিনদেশীয়দের বাহিরে থাকতে বারণ করা হলো।

তবু মরলো মানুষ। রক্ত-খেকোরা ঘরের ভেতরে হানা দিতে শুরু করলে। বিশেষ করে যারা দিন আনে দিন খায়, যারা ছোট ছোট চালা ঘরে বাস করে, তাদেরই চালা ফালা ফালা করে ঢুকে পড়ে আর বড় ছোট সবাইকে ঘায়েল করে যায়।

রাজা মাথায় হাত দিলেন। উপায় না দেখে দেশে দেশে ঘোষণা করে দিলেন, বিপদের দিনে যে রাজ্যকে রক্ষা করতে পারবে, যে রক্ত-খেকোদের মেরে ফেলতে পারবে, তাকে অর্ধেক রাজ্যসহ রাজকন্যা দান করবেন।

দেশ-বিদেশ থেকে একে একে এলেন কত বীর, কত সাহসী, কত রাজপুত্তুর, কত মন্ত্রী পুত্তুর। তাঁরা ঘোড়ায় চড়ে তরোয়াল উঁচিয়ে রাক্ষস মারতে গেলেন। না, ফিরলেন না কেউ। না ঘোড়া, না ঘোড়ার মালিক। এখানে ওখানে বনে-বাদাড়ে পাওয়া গেল মৃতদেহগুলোকে।

ভিনদেশে বাস করতো দুখন নামে এক গরীবের ছেলে। তার বাপ ছিল না, মাও ছিল না। দুখন ভাবলে, মা-বাপ যার নেই তার ঘরে থেকে কি লাভ? খিদে পেলে কেউ খেতে বলে না, অসুখ হলে মাথার কাছে কেউ বসে থাকে না, দেরি করে বাড়ী ফিরলে কেউ বকাঝকাও করে না। তাই মনের দুঃখে ঘর ছেড়েছিল দুখন। পথে পথে ঘুরে বেড়াতো আর তার ছোট্ট বাঁশের বাঁশীতে সুর তুলতো। সে সুর তো নয়, যেন বুকফাটা হাহাকার! যে শুনতো, সেই-ই চোখের জল ফেলতো। দু-চারটে করে পয়সাও দিতো। তাতেই দিন চলে যেতো দুখনের।

একদিন সে শুনলে, পাহাড়ের ওপারে সোনার দেশটা ছারখারে যেতে বসেছে, হাজার হাজার মানুষ মরছে রক্তখেকোদের হাতে। গরু-বাছুর, হাতি-ঘোড়া তারাও।

দুখন ভাবলে মনে মনে, যার বাপ নেই, মা নেই, ভাই নেই, বোন নেই, সংসারে যার বাঁধন নেই, তার জীবনে সুখ নেই। তার চেয়ে পরের উপকারে যদি জীবনটা যায়, তাতেই সুখ।

কাঁধে থলে আর হাতে বাঁশী নিয়ে বেরিয়ে পড়লে দুখন। কয়েক দিনের খাবার জোগাড় করে ধরলে ধু ধু মরুভূমির পথ। গাছ নেই, পালা নেই, চারদিকে শুধু ধসধসে ধূসর বালি। দিনে বেজায় গরম, রাতে শীত। রাতে আর সকালবেলাটা হাঁটে দুখন, আর বেলা বাড়লে মরুদ্যানে খেজুর গাছের তলায় পড়ে পড়ে ঘুমায়—নয়ত আপন মনে বাঁশী বাজায়।

একদিন সকালবেলায় দুখন দেখলে, বালির বরণ একটা সাপ বালিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে, আর বাদ্যকরদের ঝুমঝুমির মত আওয়াজ তুলছে ঝুম-ঝুম-ঝুম। এমন আজব সাপকে দেখে অবাক হলে দুখন। কাছে যেতে সাপটা মুখ তুলে করুণ সুরে বললে—ভাই দুখন! তেষ্টায় আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। দিতে পারো আমায় একটুখানি জল!

দুখনের বোতলে জল ছিল না। একটু আগেই সবটুকু খেয়ে ফেলেছে। আশা আছে, পথে যেতে যেতে পান্থপাদপ গাছ অবশ্যই দেখতে পাবে। তখন গাছের ডগা চিরে জল নিয়ে বোতলে পুরবে। এখন উপায় না দেখে ট্যাঁক থেকে তার ছোট্ট ছুরিটা বার করে বাঁ হাতের কড়ে আঙুলটাতে বসিয়ে দিলে। ফিনকি দিয়ে ছুটলো রক্ত। সাপের মুখে আঙুলটা চেপে ধরে বললে—নাও, যতখুশি খেয়ে নাও। তেষ্টাও মিটবে—খিদেও যাবে।

অবাক হলে সাপটা। তবু খেলে। আর একটু পরেই ফিরে পেলে বল। বললে—আমাকে বাঁচাতে গিয়ে তুমি যা করলে—তা কেউ কোনদিন করে না। আমাকে সাথে নাও। যদি কোনোদিন পারি, তাহলে তোমাকেও বাঁচাব আমি।

দুখন ঝুমঝুমি সাপটাকে থলেতে পুরে হাঁটা শুরু করলে। একটু পরেই পৌঁছলে পাহাড়ের কাছে।

পাহাড়ে উঠতে গিয়ে বিপাকে পড়লে দুখন। একেবারে খাড়া পাহাড়। এবড়ো-খেবড়ো। দুহাত উঠলেই হাঁফ ধরে।

তবু দুখন হার মানলে না। একটু উঠে, একটু জিরোয়। এক সময় দেখলে, বড় এক গর্তের ভেতরে পড়ে আছে এক আজব জানোয়ার, অনেকটা ভেড়ার মত, তবে অনেক বড়, ঠ্যাংগুলো লম্বা লম্বা, চেহারাটাও যুৎসই। দুখনকে দেখে সে বললে—ভাই দুখন, দলের সাথে আসতে আসতে আচমকা গর্তের ভেতরে পড়ে গেছি আমি। আমাকে তুলতে পারবে? তাহলে সারা জীবন তোমার কেনা হয়ে থাকবো।

দুখন ভাবলে একটু। তারপর বললে—তুমি গর্তের এক পাশে সরে দাঁড়াও। এখানে অনেক পাথরের চাঁইকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়তে দেখছি। আমি সেগুলোকে গড়িয়ে দেবো। উঁচু হয়ে উঠলে তুমি লাফ দিয়ে উপরে উঠে আসতে পারবে।

সেই আজব জানোয়ারটা উঠে এলো। দুখন তাকে শুধোলে—তুমি কে ভাই?

জানোয়ারটা বললে—আমি লামা। পাহাড়ে উঠতে আমার জুড়ি নেই। পাহাড়ের বাহন বলতে পারো। এসো, আমার পিঠে চেপে বসো, পাহাড় পার করিয়ে দেবো তোমাকে।

দুখন যেন হাতে চাঁদ পেলে। চেপে বসলে লামার পিঠে।

হট্ হট্ করে এগিয়ে গেল লামা। পাহাড় ডিঙিয়ে ওপারে যখন পৌঁছলে, তখন দিনের আলো নিভে গেছে। চারদিকে পোকামাকড়দের ঝিন ঝিন ছাড়া কোন জীবের গলার আওয়াজ শুনতে পেলে না। শুনতে পেলে না পাহাড়ী মানুষের চেঁচামেচি, পাখীর কলরব, সাপের হিস্‌হিস্। দুখন বুঝতে পারলে, সেই ভয়ানক দেশেই এসে পড়েছে তারা। কাছাকাছি কোন লোকালয় না দেখে ভয়ও পেলে। আঁধার ঘনিয়ে উঠলে কোথায় গা-ঢাকা দিয়ে থাকবে তারা?

মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে লাগলে দুখন। কোন কুলকিনারা করতে

না পেরে সাথীদের বললে—ভাই সব! আমরা এক আজব দেশে এসে পড়েছি। এখানে রোজ রাতে হানা দেয় রক্তখেকো রাক্ষসরা। তোমরা কোন নিরাপদ জায়গায় লুকিয়ে পড়, আমার যা হবার হোক গে!

শুনে হাসলে লামা। বললে—ভয় নেই। তোমরা আমার কোলের কাছে শুয়ে থাক, আমার কাছে কেউ ভিড়বে না।

—কেন? অবাক হলে দুখন।

লামা বললে—লামাদের কেউ চটাতে আসে না। এমন দুর্বুদ্ধি যদি কারও হয়, তাহলে আমরাও ছেড়ে কথা বলি না। পেটের ভেতর থেকে উগরে বার করে আনি আধা হজম করা খাবার। তারপর থুথুর সঙ্গে ছিটিয়ে দিই। বিচ্ছিরি ও বিদঘুটে গন্ধে ভূতও পালায়।

ঝুমঝুমি বললে—আমার বিষের জ্বালাও ভয়ানক। এক এক কামড়ে এক একটা হাতীকেও ধরাশায়ী করতে পারি।

ধীরে ধীরে আঁধার গাঢ় হয়ে উঠলো। পাহাড়ের খাঁজে একটা অগভীর গর্তের ভেতরে ওরা তিনজনে পড়ে রইলো চুপচাপ। দেখতে চাইলে, রক্তখেকোরা কারা? রাক্ষস-খোক্কস, দত্যি-দানা, না কোন জানোয়ার?

গভীর রাতে শত শত রাক্ষসীর দাঁত-খিঁচানোর মত খ্যাঁক-খ্যাঁক, খিচ্-খিচ আওয়াজ, কানে ভেসে এলো। সজাগ হয়ে উঠলে সবাই। ফণা উঁচিয়ে ধরলে ঝুমঝুমি, আর লামা তৈরি হলে মুখে থুথু পুরে।

সহসা আকাশে মিশ কালো এক টুকরো মেঘ ভেসে উঠলো, যেন। দেখেই বুঝতে পারলে লামা। বললে—এই রে, এ যে রক্তখেকো ভ্যাম্পেয়ার বাদুড়। দলে যে হাজার খানেকের মত দেখছি।

অবাক হলে দুখন। বললে—তাহলে দৈত্য, রাক্ষস, ওরা কেউ নয়?

—রাক্ষসদের চেয়েও ভীষণ। ওরা শিকার খুঁজতে আকাশে ওঠে। চক্করের পর চক্কর দেয়, আর পাখা দিয়ে সুপারসনিক ছড়ায়। সেই সুপারসনিক বহু দূরে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর শিকারের গায়ে লেগে ফিরে এলেই ধরা পড়ে এদের কানে। তক্ষুণি ছুটে যায় এবং একযোগে লাফিয়ে পড়ে শিকারের ঘাড়ে।

—তাহলে ওদের মেরে ফেলার উপায়?

ঝুমঝুমি সাপটা চুপ করে ছিল। এবার সে বললে—ওরা শিকার থেকে ফিরে আসুক, আমিই খুঁজে বার করবো ওদের আস্তানা।

—কেমন করে? শুধোলে দুখন।

ঝুমঝুমি বললে—আমার জাতের এমন এক অদ্ভুত গুণ আছে, যা অপর কোন জীবের নেই। উপরে নিচে যেদিক দিয়ে হোক, বায়ুতে সাঁতার কেটে যে কেউ ছুটে যাক না কেন, তাতে বায়ুর চাপ ও তাপের সামান্য হলেও তারতম্য ঘটে। সেই তারতম্যটুকু আমরা ধরতে পারি এবং অতি সহজে চোখ বন্ধ করেও অনুসরণ করতে পারি।

আরও একদফা অবাক হলে দুখন।

বাদুড়রা ফিরলে সেই শেষ রাতে। ঝুমঝুমি জেগেই ছিল। সে সুড়সুড় করে এগিয়ে গেল বাদুড়দের পেছনে পেছনে। ফিরে এলো ভোর বেলা। হাসতে হাসতে বললে—ওদের বাসার ঠিকানা পেয়ে গেছি। বাস ওদের পাহাড়ের চূড়ায়। মানুষ সেখানে যেতে পারে না বলে এখনও হদিস কেউ পায় নি।

দুখন বললে—তাহলে আমরা যাবো কেমন করে?

লামা বললে—ভাববার দরকার নেই। আমিই নিয়ে যাবো তোমাকে। বল, এখন কী করতে হবে?

ঝুমঝুমি বললে—আমি দেখে এসেছি, গুহাটা ছোট। ওর একটাই মুখ। ঠাসাঠাসি হয়ে ঝুলছে ছাদ থেকে—আমার নাগালের বাইরে। খানকয়েক আঠাওয়ালা শুকনো কাঠ নিয়ে চলো। গুহামুখে আগুন ধরিয়ে দিলে আর খানকয়েক আগুন ধরিয়ে ভেতরে ছুঁড়ে মারলে বাছাধনরা সবাই অক্কা পেয়ে যাবে।

ঝুমঝুমির খুব তারিফ করলে দুখন। বন থেকে কুড়িয়ে আনলে মোটা মোটা শুকনো পাইন কাঠ। লামার পিঠে চাপিয়ে এবং নিজে চেপে এগিয়ে গেল গুহার দিকে। আগে আগে পথ দেখিয়ে চললো ঝুমঝুমি।

বাদুড়রা ভরপেটে ঘুমোচ্ছিল তখন। দিনের বেলায় ওদের চোখে ধাঁধাঁ লাগে, রাতেও ভাল দেখে না। তাই আঁধার ওদের ভারি পছন্দ।

দুখন একটু দূরে গিয়ে চকমকি ঠুকে আঠাওয়ালা কাঠগুলোতে আগুন ধরালে। কাঠগুলো যখন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো তখনই একে একে ছুঁড়ে মারলে ভেতরে। নিজে জ্বলন্ত কাঠ হাতে দাঁড়িয়ে রইলে গুহা মুখে। দুপাশে থাকলো ঝুমঝুমি আর লামা। একটাও যদি কেউ ছিটকে বেরিয়ে আসে তাহলে ঝুমঝুমি বিষ ঢেলে আর লামা পায়ের চাটে সাবাড় করে ফেলবে।

না, বাঁচতে হলো না কাউকে। সোনার কৌটায় রাখা সাতশ রাক্ষসীর প্রাণ ভোমরাটাকে তরোয়ালের এককোপে কেটে ফেলার মত একখানা পাইন কাঠ জ্বালিয়ে হাজার বাদুড়কে মেরে ফেললে। আগুন নিভলে দুখন বাদুড়গুলোকে একে একে টেনে বার করে আনলে। বুনো লতায় সবাইকে বেঁধে চাপিয়ে দিলে লামার পিঠে। সেখান থেকে রাজবাড়ীটার নিশানাও ঠিক করে নিলে এবং সোজা এগিয়ে গেলে।

রাজবাড়ীতে যখন পেঁছিলে তখন সন্ধ্যে হয় হয়। পথঘাট একেবারে ফাঁকা—খাঁ খাঁ করছে। দোকানপাটের ঝাঁপ বন্ধ, ঘরের দরজা বন্ধ, এমনকি রাজবাড়ীর সিংহ দরজাটাও বন্ধ।

দুখন সিংহ দরজায় ধাক্কা দিতে দিতে রাজা মশাইর নাম করে খু-উ-ব ডাকলে। চিৎকার করে জানিয়ে দিলে—যে যেখানে আছেন, বেরিয়ে আসুন! রক্তখেকোদের মেরে নিয়ে এসেছি। এতকাল ধরে দেশের যারা সববনাশ করেছে, হাজার মানুষের রক্ত খেয়েছে, পশুপাখীদের লোপাট করেছে, তাদের একবার চোখ ভরে দেখে যান!

রাজা মশাই পাশের ঘরে দোর দিয়ে পাত্র-মিত্রদের সাথে গত রাতে রক্ত-খেকোদের বীভৎস কীর্তির কথা আলোচনা করছিলেন আর চোখের জল ফেলছিলেন। আচমকা দুখনের চিৎকার শুনে ছুটে বেরিয়ে এলেন ঘর ছেড়ে। পেছনে পেছনে ছুটে এলেন মন্ত্রী, সেনাপতি—সবাই। এমনকি রাজবাড়ীর দাস-দাসীরাও বাদ পড়লে না।

সিং দরজা খুলতে তো সবাই অবাক! একি? কোথায় রাক্ষস-খোক্কস! এ যে কতকগুলো পোড়া বাদুড়! বিশ্বাস করতে পারলেন না কেউ। বললেন—এতটুকু প্রাণীরা মানুষের কী ক্ষতি করতে পারে?

দুখন হেসে বললে—যারা যত ছোট, তারা তত বেশী ক্ষতি করে। চোখে দেখা যায় না যে ভাইরাস– তারা দেশকে দেশ উজাড় করে দেয়। মশা-মাছি কত ছোট, তবু তার দাপটে দুনিয়া কেঁপে ওঠে। এতো ভ্যামপেয়ার বাদুড়। রক্ত-খেকো। যদি বিশ্বাস না হয়, তাহলে পরখ করে দেখুন আজ রাতে।

সে রাত গেল, পরের রাত গেল, তার পরের রাতও। সাড়া পাওয়া গেল না কারও। লোকজন সারারাত হৈ-হল্লা করে ঘুরে বেড়ালে—মরলো না একজনও। এবার বিশ্বাস হলো সবার। রাজা, মন্ত্রী থেকে রাজ্যের সাধারণ মানুষ, সবাই গুণগান করলে দুখনের। রাজকবি গান

রচনা করলেন, পল্লী-কবিরা ছড়া বাঁধলেন। রাজা প্রাসাদের একটা অংশ ছেড়ে দিলেন, হাজার দাস-দাসী দিলেন, অঢেল টাকা দিলেন, দামী আসবাব দিলেন, আর রাজ্যের যত ভাল ভাল খাবার সবই দুখনের জন্য বরাদ্দ করলেন। শেষে নিজের ছোট-মেয়ের সঙ্গে দুখনের বিয়ের পাকা কথা দিলেন।

বিয়ের দিন সকাল থেকে রাজবাড়ীতে বেজায় ভিড়। প্রাসাদকে ফুলে ফুলে সাজানো হয়েছে, রাজার হাতীর পিঠে সোনার হাওদা উঠেছে, সৈন্যরা কুচকাওয়াজ করছে, সিং দরজায় বসেছে নহবত-রোশন চৌকি।

একসময় এক প্রহরী এসে খবর দিলে দুখন পালিয়েছে। হাজার দাস-দাসীর চোখকে ফাঁকি দিয়ে দুখন তার ঝুমঝুমি সাপ আর লামাটাকে নিয়ে কখন যে পালিয়েছে কেউ জানে না। পোশাক-আসাক, টাকাকড়ি কিছু নেয়নি।

রাজার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো। ঘোড়া ছুটিয়ে সারা রাজ্য তন্ন তন্ন করে খোঁজা হলো, তবুও পাওয়া গেল না দুখনকে।
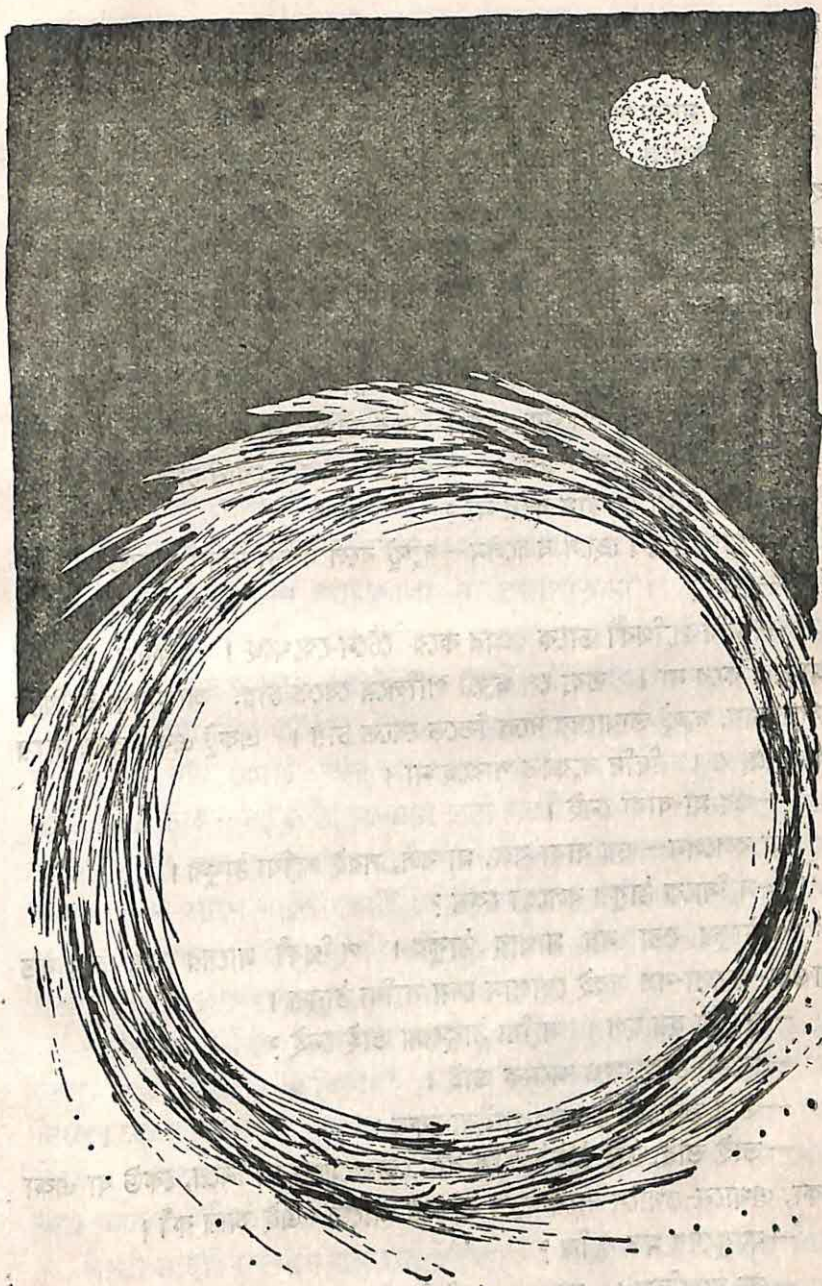
সাদা বামন

খোকা মাকে শুধোলে—চাঁদ কেন মামা ?

মা একগাল হেসে বললেন—আমরা যার জল খেয়ে, ফল খেয়ে, হাওয়া নিয়ে আর ঠিকরে পড়া আলো পেয়ে বেঁচে থাকি—সেই পৃথিবী মায়ের ভাই বলে চাঁদ আমাদের মামা।

—চাঁদ মামার বোন আছে, বড়দিদি ! আমার মত ?

—হ্যাঁ। তোরই মত।

—চাঁদ মামার বুঝি আর ভাই নেই, পৃথিবী মায়ের ?

—হ্যাঁ, অনেক—অনেক ভাই। কত ভাই-র নাম চাই ?

—ওদের আর বোন নেই ? —না, ঐ একটি বোন চম্পা যেন।

—চাঁদ মামা দুষ্টুমি করে না ?

মা চোখ টিপে হেসে বললেন—দুষ্টু বলে দুষ্টু, তোর চেয়েও।

—কেন ?

—দিদি পৃথিবী তাকে জোর করে টেনে রেখেছে। একটুও চোখের আড়াল করে না। তবু সে ছুটে পালিয়ে যেতে চায়, আকাশে হারিয়ে যেতে চায়, দুষ্টু তারাদের দলে ভিড়ে যেতে চায়। একটু একটু করে দূরে পালাচ্ছে ও। দিদি বুঝতে পারছে না।

—ওর মা-বাবা নেই।

মা বললেন—ওর বাবা বল, মা বল, সবই সূয্যি ঠাকুর।

—সূয্যিকে ঠাকুর বলছো কেন ?

—ঠাকুর তো নয় মাথার ঠাকুর। পৃথিবী মায়ের জল, ফল, যত হাওয়া-আলো-বল সবই যোগান দেয় সূয্যি ঠাকুর।

—তা না হয় হল। সূয্যি ঠাকুরের ভাই নেই ?

—সূয্যি ঠাকুরেরও অনেক ভাই।

—তার ভাইদের দেখতে পাইনা কেন ?

—ভাই ভাই, ঠাঁই ঠাঁই। যে যার ছেলেমেয়েদের নিয়ে, কেউ বা একা একা, এখানে-ওখানে দূরে দূরে ছড়িয়ে আছে—এই আর কী !

—কাকুদের মত বুঝি ?

—যা বলেছিস ! যে যার ফ্যামিলি নিয়ে আছে। আমাদের সূয্যি-ঠাকুরের ফ্যামিলিতে পৃথিবী আর তার ভাইরা—সবমিলে সৌর জগৎ।

তবে হ্যাঁ, সূয্যি ঠাকুরের সাথে তার আর এক ভাই ছিল। অনেকটা সূয্যিঠাকুরের মত—যেন যমজ ভাই। সে অকালে মরে গেছে।

—মারা গেছে? কেন মা?

—অকালে যারা মরে, তারা নিজের দোষেই মরে।

—কী দোষ করেছিল?

সে এক কাহিনী।

গপ্পের গন্ধ পেয়ে খোকা মাকে বললে—তুমি বল না মা, আমি শুনবো!

মা শুরু করলেন।

সে অনেক-অনেককাল আগের কথা। সাত-আট কোটি বছর আগে হলেও হতে পারে। আকাশে ঘুরছিল এক মা। লক্ষ লক্ষ কোটি দৈত্যদের জুড়লে যা হয়—তার চেয়েও বিশাল ছিল চেহারা। পেটটা ছিল ফুটবলের মত গোল। সে পেটটা আবার এত বড় ছিল যে, লক্ষ লক্ষ সূয্যি ঠাকুর তার ভেতরে চলাফেরা করতে পারতো।

সে মা ছিল যেন আরশোলা বা প্রজাপতি মা। পেটে ছিল যেন হাজার হাজার ডিম। প্রজাপতি মায়েদের মত ডিম সে পাড়লে না। জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে পেটটা তার ফেটে চৌচির হয়ে গেল। ডিমগুলো ছিটকে বেরিয়ে গেল এদিকে ওদিকে—মহাকাশের চারদিকে।

সাড়ে পাঁচ কোটি বছর আগে পাশাপাশি দুটি ডিম ফুটে জন্ম নিল দুটি যমজ ভাই—সূয্যি ঠাকুর এবং তার সাথী ভাইটি। ডিমের ভেতরে লালার মত মায়ের দয়ায় পেয়েছিল খাবার—হাইড্রোজেন। যখন জন্ম নিলে তখন আশে পাশে কোটি কোটি মাইল দূরে ছিল আরও খাবার। সেইগুলো শোষণ করে শরীরটা ফাঁপিয়ে তুলতে চেষ্টা করলে। ফাঁপিয়ে ফেললেও। রোজগার দুজনেই ভাল করলে।

সূয্যি ঠাকুর ছিল সাদামাঠা লোক—একেবারে মাটির মানুষ। এত তেজ, এত ক্ষমতার অধিকারী হয়েও কোনরকমে ভড়ং দেখালে না। নিজের তেজের উৎসকে দরকার মত খরচ করে সাদাসিধে জীবনকে বেছে নিলে। অপরের ভালর জন্যে নিজেকে বিলিয়ে দিলে। অধিক শোষণ করে নিজের ভুঁড়িও বাড়ালে না।

সাথী ভাইটি শোষণে মত্ত হয়ে উঠলো। লাভ করলো প্রচুর বিত্ত। এবার বিত্ত পেয়ে চিত্ত বিকল হলো তার। কী দেমাক! যেন কুবেরের ধনের মালিকানার দেমাক। সবার উপরে টেক্কা দিতে চাইলে, নিজের

শক্তিকে জাহির করতে চাইলে, বুঝি বা সূর্য্যি ঠাকুরকে পুড়িয়ে মারতে চাইলে নিজের তেজকে শতগুণে বাড়িয়ে। একটা আতঙ্ক হয়ে দাঁড়ালে যেন।

না, সূর্য্যি ঠাকুরের কিছুই হলো না। আরও হিংসে হলো তার। আরও আরও বাড়িয়ে দিলে তেজ। শেষ অবধি নিজেই ফতুর হয়ে গেল।

তবু ঠেকেও শিখলে না, দেখেও শিখলে না। নবাবী মনোভাবকে বদলালেও না। হিংসে সেই ষোল আনাই। রসদ যখন ফুরিয়ে গেছে তখন নিজের শরীরটাকে ফাঁপিয়ে সূর্য্যি ঠাকুর আর তার ছেলেমেয়েদের গিলে ফেলতো চাইলো। শরীরটা হয়ে উঠলো টকটকে লাল। পরিণত হলো লাল এক দানবে।

তবুও নাগাল পেলে না কারও। শেষবারের মত চাইলে সবাইকে ধ্বংস করতে। বুক থেকে খসিয়ে আনলে বিরাট বিরাট চাঁই। একই সঙ্গে ছুঁড়ে মারলে চারদিকে। আর যত শক্তি ছিল সবটুকু প্রয়োগ করে তেজ বাড়িয়ে দিলে হাজার গুণ।

এবার জ্বলে পুড়ে একেবারে খাক হয়ে গেল। একটু পরেই ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো দেহটা। নিজের শরীর থেকে মাংস খসিয়ে নেওয়ার ফলে আকারটাও হয়ে গেছে এই এত্তটুকু। তারাদের রাজ্যে বেঁটে এক বামন হয়ে গেল—সাদা বামন। টেক্কা দেওয়া আর হিংসের সাজা হাতে হাতে পেলে, নিভে গেল চিরতরে।

পাতালপুরীর বেঁটে বামনরা আবার ভারি হিংসুটে কিনা! এখনও মহাকাশের নিকষ কালো আঁধারে বামনরূপে সে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মনে সেই ক্ষতি করার নেশা। সূর্য্যিঠাকুর খারাপ জেনেও ভাইর মমতা ছাড়তে পারে নি। কোটি কোটি বছর পরে মাঝে মাঝে কাছাকাছি আসে। রাগ তার এখনও পড়েনি বললে এসে পড়লে সূর্য্যিঠাকুর এবং তার পরিবারে অশান্তি আসে। শেষবার এসেছিল সাত কোটি বছর আগে।

নীলপরী-লালপরী

তারায় ভরা আকাশের দিকে এই প্রথম তাকালে খোকন। অবাক হলে—ঐ যে আকাশের গায়ে রোদের দিনে সরু পায়ে চলা মেঠো পথের মত, ধনুকের বাঁকের মত, মায়ের কোমরে চন্দ্রহারের মত তারা ঝিলমিল আকাশের এপার থেকে ওপারে পাড়ি দেওয়ার পথটাকে দেখে। মা বললেন—আকাশগঙ্গা-ছায়াপথ। অতি দূরের রাশি রাশি তারাদের আলোয় আলোকিত বলয়ের আধখানা।

খোকন অতশত বোঝে না। মাকে শুধোলে—ছায়াপথ? ওপথে কারা যায়, কারা আসে?

মা মুচকি হেসে বললেন—ওপথে পাড়ি জমায় পরীরা। পৃথিবীর বুকে নেমে পড়ে, আবার ফিরে যায়।

খোকন তাকালে। বারে বারে তাকালে। তবু একটাও পরীকে দেখতে পেলে না। পুনরায় মাকে শুধোলে—কেমন পরী মা?

মা বললেন—নীলপরী আর লালপরী। পাতলা ডানায় ভর করে ফুলের মালা হাতে রাতের বেলায় ওরা নেমে আসে দলে দলে। সারারাত হিমালয়ের বনে বনে ঘুরে বেড়ায়, খেলা করে, পৃথিবীর হাওয়া খায়। আর ভোর হলে হিমালয়ের চূড়ায় মানস সরোবরে চান সেরে ফিরে যায় আকাশে।

খোকন হাঁ করে আবার তাকালে। ভাবলে, বুঝিবা আকাশটা নেমে এসে যেখানে পৃথিবীর সাথে মিশে গেছে, সেইখানেই হিমালয়। হায়রে হায়! সে যদি হিমালয়ে যেতে পারতো, তাহলে মানস সরোবরে গিয়ে পরীদের সাথে ভাব জমাতো। ওদের কেউ না কেউ তাকে নিয়ে যেতো আকাশে। ভারি মজা হতো তাহলে।

এক সময় খোকন দেখলে, আকাশ থেকে ঝুরঝুর ফুলঝুরির মত সাদা সাদা আলোর ফুলকি ঝরে পড়লো। খোকন খুশিতে ডগমগ হয়ে বললে—দেখ, দেখ মা, আকাশ থেকে পরীদের হাতের মালা কেমন নেমে আসছে!

একটু পরে ফুলঝুরি গুলো আকাশে বিলীন হয়ে যেতে খোকনের মনটা খারাপ হয়ে গেল। শুকনো মুখে বলে—মাগো, মালা যে হারিয়ে গেল! পরীরা নামলে না কেন—সেই নীলপরী-লালপরী?

মা বললেন—পরীরা নামেনি। বাসি ফুলের মালাগুলোই শুধু ছুঁড়ে দিয়েছিল। সেগুলো তীরবেগে নেমে আসছিল পৃথিবীর বুকে। পৃথিবীর বায়ু তাকে পুড়িয়ে ছাই করে ফেললে।

রাত হলো। মা খোকনকে নিয়ে বিছানায় এলেন। খোকন মায়ের বুকে মুখ গুঁজে পরীদের কথাই ভাবতে শুরু করে দিলে। কেমন সেই নীলপরী আর লালপরী। কত বড় তারা? তাদের ডানাগুলোই বা কেমন? কেমন করে ওরা আকাশে ঘুরে বেড়ায়? হায়রে, তার যদি পরীদের মত অমন দুখানা ডানা থাকতো!

এক সময় খোকন দেখলে, আকাশ থেকে তরতর করে নেমে এলো দুটো পরী। সেই নীলপরী আর লালপরী। হাতখানেক উঁচু, মায়ের নীল ও লাল বেনারসীর মত দুজনের গায়ের রঙ, হাওয়ার মত হালকা আর আলোর মত পাতলা ফিনফিনে এক এক জোড়া ডানা, তার খেলা-ঘরের পুতুলদের মত চোখ-কান-নাক-মুখ। হাসতে হাসতে তারা বললে —কী গো খোকন, যাবে আমাদের সাথে?

খোকনের মনটা নেচে উঠলে। বললে—যাবো, যাবো, আমি যাবো মানসসরোবরে। তারপর তোমাদের সাথে আকাশ গঙ্গা ধরে ছুটবো তারাদের রাজ্যে। চলো, এখুনি বেরিয়ে পড়া যাক্।

পরীরা বললে—আমরা কত ছোট! তোমাকে বহে নিয়ে যাবো কেমন করে?

খোকনের মনটা মুষড়ে পড়লে। বললে—তাহলে আমার কী যাওয়া হবে না?

পরীরা বললে—একটা উপায় আছে। তোমাকে আমরা কড়ে আঙুলের মত ছোট্টটি করে দিচ্ছি। রাজি আছো তো বল?

খোকন বললে—খুব রাজি!

পরীরা দুজনে খোকনের দুটো হাত ধরলে। আর কপালে ছোঁয়ালে যাদুকাঠি। শুরু করলে মন্তর পড়তে। কী সব বিছ্‌ছিরি মন্তর!

ফ্যাচ্ ফ্যাচাঙে ফ্যাকাশে
খোকা যাবে আকাশে।
হিম হিমাকত হিমে লয়
খোকা যাবে হিমালয়।
যৎ যাদুকর এয়ে যা
আঙুলপানা করে যা।

দেখতে দেখতে খোকন এত্তটুকু হয়ে গেল। পরীরা এবার হাত ধরাধরি করে শুরু করলে নাচতে। খোকন চিংড়িদের মত, ঘাসের ডগায় ফড়িং আর উচ্চিংড়েদের মত, তিড়িং করে মারলে এক লাফ। তারপর পরীদের হাতের উপরই বসে পড়লে।

পরীরা এবার প্রজাপতিদের মত মেলে দিলে ডানা। দুজনে দুহাতে খোকনের দুটি হাত ধরে তরতর করে উঠে গেলে আকাশে।

চারদিকে ঘুটঘুটটি আঁধার। কে যেন সারা দুনিয়াটার গায়ে ভূষা-কালি মাখিয়ে দিয়েছে। কোথায় মানস সরোবর, আর কোথায়ই বা আকাশ গঙ্গা—তারাদের দেশ। এক চুল দূরের জিনিসও চোখে পড়ছে না, এমনকি পরীদের গায়ের আর পাখনার রঙের জৌলসও ধরা পড়ছে না চোখে।

খোকার গা-টা কেমন যেন ছমছম করে উঠলো, ভয়ও হলো। পরীদের শুধালে—আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছো তোমরা—মানস সরোবরে !

নীলপরী বললে—না, আকাশপথে সোজা আমাদের রাজ্যে—নীল তারা ও লাল তারার দেশে।

– এত আঁধার কেন ? এমন আঁধার তো কখনও দেখিনি ! তবে কী ভুল করে পাতালপুরীর দৈত্যদের রাজ্যে এসে পড়েছো ?

না, আলোর দেশে বাস কর বলে কালোর কথা কিছুই জানো না। সারা দুনিয়াটা এমনই কুচকুচে কালো-পাতালপুরী। শুধু তারাদের আলো কারও উপরে পড়লেই আলোকে দেখ।

খোকা আঁৎকে উঠলে। বললে—কাজ নেই অমন কালোর দেশে। আমাকে রেখে এসো আমার মায়ের কাছে।

লালপরী বললে—তাও কী হয় ? তোমাকে কালোর বুক চিরে এগিয়ে যেতেই হবে। তাছাড়া তুমি তো এই এত্তটুকু হয়ে গেছো—কড়ে আঙুলের মতো। তোমার মা তোমাকে দেখতে পাবে না, চিনতেও পারবে না।

আরও ভয় পেলে খোকন। অনুনয়ের সুরে বললে—তোমাদের পায়ে পড়ি, আমাকে সেই আগের খোকন করে দাও।

পরীরা কিছুই বললে না। আরও জোরে, আরও জোরে উপরে উঠতে লাগলে যেন। খোকনের কেমন যেন দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগলো, শরীরটা কাঁপতে শুরু করলো, মাথাটাও ঘুরতে লাগলো বনবন করে।

চিৎকার করে বললে—না, না, তারাদের রাজ্য বড় ভয়ানক ! আমি যাবো না, কিছুতেই যাবো না।

এবারও পরীরা নীরব রইলে। আরও গাঢ় হয়ে উঠেছে আঁধার। পরীদের কিছুতেই আর ঠাওর করতে পারলে না খোকন। শুধু তার মনে হলো কে বা কারা যেন আলতোভাবে তার হাতদুটোকে ধরে রেখেছে। শরীরটাও বাড়তে বাড়তে যেন আগের মত হয়ে গেছে। এবার গায়ের যত জোর ছিল, সবটুকু জড় করে লাফিয়ে পড়লে পরীদের হাত থেকে।

পরীরা হি হি করে হেসে উঠলে। সহসা মাথার উপর ফুটে উঠলো দুটি তারা—নীলতারা ও লালতারা। তারার আলোতে খোকন দেখতে পেলে, দু-রঙের পরী দুজনে তারা দুটোর সাথে একেবারে বিলীন হয়ে গেল।

খোকন এবার উপরে উঠতেও পারলে না, নিচের দিকে নামতেও পারলে না। চরকির মত পাক খেয়ে খেয়ে বনবন করে ঘুরতে লাগলে। তারপর সজোরে ফেটে গেল দেহটা। টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়লে চারদিকে।

ভ্যাঁ করে কেঁদে উঠলে খোকন। তার কাঁদায় ঘুম ভেঙে গেল মায়ের। মাথার কাছে বিজলীবাতির বোতাম টিপলেন। থৈ থৈ আলোর বানে ভরে গেল ঘর। মা খোকনকে আরও কাছে টেনে নিয়ে বললেন—কাঁদলি কেন রে! এই তো তুই আমার কোলে শুয়ে আছিস। ভয় পেয়েছিলি বুঝি?

খোকন সহসা যেন বিশ্বাস করতে পারলে না। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলে মায়ের মুখের দিকে।

ঘোর কাটতে বেশ দেরি হলো। খোকন বললে—পরীদের কথায় ভুলবো না। তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাবো না—মানস সরোবরেও না, তারার দেশেও না।

মা হাসলেন। বললেন—শুতে যাওয়ার আগে তোকে পরীদের কথা বলেছিলাম তো, তাই পরীদের স্বপ্ন দেখেছিস ঘুমের ঘোরে।

প্রথম ছেলেটির মত যেদিন রানীমার দ্বিতীয় ছেলেটিও আঁতুড় ঘরে মারা গেল সেদিন রানীমা কান্নায় একেবারে ভেঙে পড়লেন। রানীমাকে কাঁদতে দেখে তাঁর দাসমহলে যত দাসদাসী ছিল, যত চাকর-বাকর ছিল, যত পরিচারিকা ছিল, তারাও কেঁদে উঠলো হাউ হাউ করে। আর কেঁদে উঠলো ঘোড়াশালায় ঘোড়া, হাতিশালায় হাতি, সোনার খাঁচায় হীরেমন পাখী এবং গোলাপ বাগিচায় ময়ূর-ময়ূরী ও হরিণ-হরিণীরা।

চারদিকে কান্নার রোল উঠতে সভার কাজ ফেলে ছুটে এলেন রাজা, ছুটে এলেন মন্ত্রী, ছুটে এলেন পাত্র-মিত্র ও সভাষদরা। মরা ছেলে কোলে রানীমাকে কাঁদতে দেখে তাঁরাও চোখের জল ধরে রাখতে পারলেন না। শুধু কাঁদলেন না রাজা। মুখটা তাঁর আষাঢ়ের মেঘের মত থমথমে হয়ে পড়লো।

রানীমা কাঁদতে কাঁদতে একসময় রাজাকে বললেন—মহারাজ, এবার আপনি সুয়োরানী ঘরে আনুন! আমি দুয়োরানী হয়ে প্রাসাদ ছেড়ে দূরে চলে যাই। আমার কপালে আছে ঐ ভাঙা কুঁড়েতে বাস, ছেঁড়া কাঁথায় শোওয়া আর মোটা চালের ভাত। গা ভরা গয়না, সাত মহলা বাড়ী, হাজার দাস-দাসী, আমার জন্য নয়।

রাজা বিরক্ত হয়ে বললেন—সে কথা পরে ভেবে দেখবো। এখন তুমি কান্নাটা থামাও দেখি!

মন্ত্রীমশাই মুখটা ভার করে বললেন—রানীমা ঠিক কথাই বলেছেন। নতুন এক রানীমা আসুক, রাজবংশ রক্ষা পাক! যদি বলেন, তাহলে আজই আমি দেশে দেশে ভাটদের পাঠিয়ে দি।

রাজা মুখটাকে হাঁড়ির মত করে বললেন—সে এখন থাক। আগে ঐ রাজবৈদ্যকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিন, তারপর ভেবে দেখবো।

রাজবৈদ্য কাছেই ছিলেন। তিনি হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন। বললেন—আমার দোষ নেই মহারাজ! এবারে কুমারকে বাঁচাতে আমি সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। কিন্তু কেন যে আঁতুড় ঘরে ওরা হলদে হয়ে যায়—বুঝতেই পারছি না। মনে হয় ওপরওয়ালা—ব্রেহ্মদত্যির কাজ।

রানীমা বললেন—আমারই কপালের দোষ। আমাকেই তাড়িয়ে দিন আর রাজবৈদ্য থাকুন। বুড়ো বয়সে যাবেন কোথায়?

মন্ত্রীমশাই বললেন—রানীমাও রানীমহলে থাকুন, বুড়ো রাজবৈদ্যকে তাড়িয়েও কাজ নেই। আপনি দ্বিতীয়বার বিয়ে করুন।

রাজা বললেন—আমার কথার নড়চড় হবে না। রাজবৈদ্যকে অবশ্যই যেতে হবে। তিনি অন্য রাজ্যে বাস করুন আর মাসে মাসে তাঁকে মাসোহারা পাঠানো হোক!

মন্ত্রীমশাই মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললেন ঃ বৈদ্য না থাকলে দেশের অবস্থাটা কী হবে ভেবে দেখেছেন কী!

বিকৃত হাসি হেসে রাজা বললেন ঃ বৈদ্যরা আজকাল ঢের ঢের চিকিৎসা করে দেখছি! শুধু পয়সাটা নেয়, রোগীদের কথা ভাবতে কী সময় পায়!

মন্ত্রীমশাই বললেন—রাজবৈদ্যকে না হয় তাড়ানো হলো, কিন্তু ভাটদের পাঠাবো তো?

রাজা গুম হয়ে গেলেন। এক সময় বললেন ঃ আপাতত ভাট পাঠানোও বন্ধ রাখুন। শুধু দেশে দেশে জানিয়ে দিন, রানীর কোলে ছেলে না বাঁচার কারণ খুঁজতে আমি একটা সভা ডাকছি। যারা যোগ দেবে তাদের হাজার টাকা পুরস্কার, আর যে কারণ দেখাতে পারবে তাকে লাখ।

সাতদিন পরে সাত রাজ্য থেকে সাতশ' বৈদ্য এলেন। বিশাল এক হল ঘরে গদি আঁটা চেয়ারে গোল হয়ে বসলেন। মন্ত্রীমশাইয়ের মুখে শুনলেন সব কথা। তখন একে একে সবাই পরীক্ষা করলেন রানীমাকে। তারপর টিপ টিপ নস্য নিলেন, শ' শ' শাস্ত্রের পাতা ঘাঁটলেন, মাথাও ঘামালেন অনেক। কিন্তু রানীমার কোলে ছেলে এলে কেন যে ক'দিনে হলদে হয়ে যায়—ধরতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত হাজার টাকা ট্যাঁকে গুঁজে সরে পড়লেন সবাই। বললেন, নির্ঘাৎ রানীমার প্রতি কোন ব্রহ্ম-দৈত্যের কু-নজর আছে।

চটেমটে আগুন হলেন রাজা। মন্ত্রীমশাইকে বললেন—আপনি তো বলেছিলেন, এরা নাকি মরাকেও বাঁচাতে পারে। দেখলেন তো, ওরা শুধু জ্যান্তকেই মারে।

মন্ত্রীমশাই আমতা আমতা করে বললেন—তাই তো দেখলাম।

হেঁড়ে গলায় রাজা বললেন—এবার রাজ্যে রাজ্যে ঘোষণা করে দিন, রানীর কোলের ছেলেকে যে বাঁচাতে পারবে তাকে লাখ মোহর পুরস্কার দেওয়া হবে। আর যে পারবে না তার গর্দান নেওয়া হবে।

মন্ত্রী ভাবলেন। পরে জিজ্ঞাসা করলেন—এইভাবে আর কতদিন অপেক্ষা করা যাবে মহারাজ!

—আপাতত বছর খানেক।

রাজা আর দাঁড়ালেন না। গ্যাট গ্যাট করে এগিয়ে গেলেন রানী মহলের দিকে।

রানী ততক্ষণে গোঁসা করে খিল দিয়েছেন। হাজার ডাকাডাকিতে তিনি যখন খিল খুলে বেরিয়ে এলেন তখন রাজা দেখলেন, কাঁদতে কাঁদতে রানীমার মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। চুলগুলো উসকো খুসকো, চোখের পাতাগুলো ভেজা ভেজা, আর গাল দুটো লাল লাল। মাটির দিকে তাকিয়ে রানী বললেন—আমার মরণ বুঝি ভাল ছিল!

বিস্মিত রাজা জিজ্ঞাসা করলেন—কেন, কী হয়েছে?

রানী বললেন—রানীর মর্যাদাকে ধূলায় লুটিয়ে দিয়েছেন, হাজার মানুষের সামনে দাঁড় করিয়েছেন, এর চেয়ে দুয়োরানীর জীবন অনেক ভাল।

রাজা হো হো করে হেসে উঠলেন। হাসি থামিয়ে বললেন—ঐ ঠুনকো মর্যাদাবোধকে দূরে সরিয়ে রাখতো! কত রাজা ভিখিরি হয়, কত রানীকে রাজসভায় প্রজাদের কাছে কৈফিয়ৎ রাখতে হয়।

রানী বললেন—ঠিক আমার জীবন!

রাজা বললেন—ধিক তোমাদের দীন মনোভাব।

এক এক করে কয়েকটা মাস কেটে গেল। কোন বৈদ্যই আসে না। একরকম হাল ছেড়ে দিয়েছেন রাজা, মন্ত্রী, সবাই। মন্ত্রী মশাই ভাট পাঠাবার কথা ভাবছেন, শান্ত্রী-সেনাপতি বিয়ের মিছিলের কথা ভাবছেন, প্রজারা অতিরিক্ত খাজনার কথা ভাবছেন, আর রানীমা ভাবছেন দুয়োরানীর দুর্বিষহ জীবনের কথা।

ঠিক সেইসময় সাত সাগর আর তের নদীর ওপার থেকে এলেন এক ষাট বছরের বুড়ো বদ্দি। রাজাকে বললেন—রানীমাকে পরীক্ষা করার আগে একটা গবেষণাগার চাই।

লাখ টাকা খরচ করে গবেষণাগার তৈরি হলো, সাত রাজ্য থেকে সাজ-সরঞ্জাম আনা হলো, সাতশ' কারিগরকে নিয়োগ করা হলো। বুড়ো বদ্দির তদারকিতে সাতাশ দিনে তৈরি হলো সাত হাজারের মত যন্ত্রপাতি। রাজা বললেন—এতদিনে একটা কাজের মত কাজ হলো।

নিন্দুকেরা বললো—কাজ না ছাই, শুধু জলের মত টাকা খরচ।

বুড়ো বদ্দি বললেন—আর কোন ভয় নেই। রানীমাকে আর ছেলে হারানোর ব্যথা পেতে হবে না। তার আগে রাজা ও রানীর দুজনের একটু করে রক্ত চাই। —সেকি! পারিষদরা ক্ষেপে আগুন হলেন। বললেন—রাজরক্ত বলে কথা, তাকে কী ঝরানো যায়? বুড়ো বদ্দির নিশ্চয়ই মাথা খারাপ। মন্ত্রীমশাই বললেন—কত বড় পবিত্র বংশে রাজা-রানীর জন্ম! তাঁদের রক্তে কী কোন দোষ থাকতে পারে?

বুড়ো বদ্দি বললেন—দোষের কথা বলছি না। এই এত্তটুকুন করে রক্ত নেবো, পরীক্ষা করবো, তারপর বিচার করে দেখবো।

মন্ত্রীমশাই বললেন—না, কিছুতেই হতে পারে না!

পাত্রমিত্ররা বললেন—বুড়ো বদ্দির মাথাটা এখনই কেটে ফেলা হোক।

রাজা বললেন—না, ও যা দেখার দেখুক গে। রক্ত নিক যদি ব্যর্থ হয় তাহলে ঘোষণা অনুযায়ী মাথা অবশ্যই কাটা হবে।

বুড়ো বদ্দি রক্ত নিলেন, পরীক্ষা করলেন, শেষে মুখভার করে রাজার সামনে দাঁড়ালেন। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন—রক্ত কেমন দেখলেন!

—যা সচরাচর ঘটে না, তাই দেখলাম আপনাদের দুজনের রক্তে।

—তার মানে?

—উভয়ের রক্তে আর এইচ ফ্যাক্টর ঋনাত্মক।

—সচরাচর ঘটে না কেন?

—প্রায় সবার রক্তে ঐটি ধনাত্মক। শুধু দু-একজনের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম দেখা যায়। তাতে আবার স্বামী-স্ত্রী দুজনের ভেতরে একজন না একজনের রক্ত ধনাত্মক হয়ে থাকে—তাতে কোনও ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু দুজনের ঋণাত্মক হলে কোলের শিশু বাঁচে না। এক ধরনের জন্ডিসে মারা যায়।

রাজা গুম হয়ে ভাবলেন কিছুক্ষণ। পরে বললেন—রানীকে ভূত, প্রেত, ব্রহ্মদৈত্য কেউ ভর করেনি?

হো হো করে হেসে বদ্দি বললেন—ওসব গাঁজাখুরি কথা।

—রানীর কোলের ছেলেকে বাঁচিয়ে রেখে প্রমাণ দিতে পারো?

—আলবৎ পারবো। রানীমার কোলে এবার ছেলে কিংবা মেয়ে যেই-ই আসুক না কেন, সে অন্তত একশ' বছর বাঁচবে।

—এক-শ-বছর ! তাহলে তোমাকে যে এখানে থেকে যেতে হয় বদ্দি !

—অবশ্যই থাকবো।

রাজা ভাবলেন কিছুক্ষণ। জিজ্ঞাসা করলেন—রানীর কোলে কে আসছে এবার—ছেলে না মেয়ে !

—বলবো না।

—কেন ? জিজ্ঞাসা করলেন রাজা।

—রাজ-রাজড়ারা মেয়েকে চায় না। মেয়ের নাম শুনলে আঁতুড় ঘরে মেরে ফেলতে চায়। অনেক ঠকেছি, আর নয়।

—রাজা হুঙ্কার দিয়ে বললেন—বলতেই হবে !

বদ্দি মশাই হাসতে হাসতে বললেন—ঠিক ধরেছি। আপনিও মেয়ে চান না। এই থাকলো সব, আমি চললাম।

রাজা বললেন—ঠিক আছে, মেয়েই সই। আপনি থেকে যান।

—লিখে দিন, মেয়ে হলে মারবেন না।

রাজা বললেন—রাজার মুখের কথাই লেখার সামিল।

খুশি হলেন বুড়ো বদ্দি। বললেন—ভাববেন না মহারাজ ! মায়ের পেটে মেয়েকে ছেলেও করে দেওয়া যায়। কিন্তু সে সময়টা পার হয়ে গেছে। ঝামেলা-ঝক্কিও অনেক। এখন সে ব্যবস্থা করতে গেলে আরও অনেক-অনেক ঝামেলা। আপাতত ছেলে কিংবা মেয়ে যেইই আসুক না কেন, হাসি মুখে গ্রহণ করুন, পরে আপনার ইচ্ছে অবশ্যই পূর্ণ হবে।

খুশি হলেন রাজাও। হাসিমুখে বললেন—মেয়েতে আমার আদৌ আপত্তি নেই। তা যাক, তুমি আমার রাজ্যেই থেকে যাও—আমার রাজবৈদ্যের শূন্যপদও পূরণ করো। প্রাসাদের মত বাড়ী দেবো, হাজার দাস-দাসী দেবো, আরও বড় গবেষণাগার বানিয়ে দেবো। রাজবাড়ীতে রাজসুখে থাকবেন আর রাজভোগ খাবেন।

বুড়ো বদ্দি বললেন—তার দরকার নেই মহারাজ ! রাজভোগে আর রাজসুখে থাকলে গরীবদের ভুলে যাবো আর হাজার গণ্ডা অসুখ এসে ভর করবে। তার চেয়ে দিন দুবেলা খাটবো-খুটবো, মোটা চালের ভাত আর কুঁচো মাছের ঝোল খাবো, সাঁঝ সকালে প্রজাদের সাথে ঘুরবো, হাসবো এবং গপ্পো করবো।

রাজা বললেন—তোমার যেমন রুচি তেমনই থাকবে।

শেষ পর্যন্ত রাজার মেয়েই হলো। চমৎকার ফুটফুটে মেয়ে যেন একফালি চাঁদ। শাঁখের মত রঙ, সাদা চাঁপাকলির মত হাত-পায়ের গড়ন, শ্বেতপদ্মের মত মুখ। খুশি হয়ে রাজা মেয়ের নাম রাখলেন শঙ্খমালা।

বুড়ো বদ্দি বললেন—কোন ভয় নেই। শঙ্খমালা দীর্ঘায়ু হবেই হবে।

নিন্দুকেরা রটালে—দীর্ঘায়ু না ছাই! কয়েকটা দিন পরে শঙ্খমালার গায়ের রঙ হলুদ হলো বলে।

এক মাস-দুমাস-তিন মাস কেটে গেল। শঙ্খমালার কোন অসুখ করলো না, গায়ের রঙ হলদেও হলো না।

এতদিনে রাজা আশ্বস্ত হলেন। রাজসভায় বললেন—বুড়ো বদ্দির কেরামতি আছে বলতেই হবে।

নিন্দুকেরা আড়ালে আবডালে বললো—কেরামতি না ছাই! মেয়ে বলেই বেঁচেছে। মেয়েদের কোষের যৌন ক্রোমোজোম জোড়াটা বাবা-মার কাছ থেকে পাওয়া একজাতীয়। ডবল এক্স্ হওয়ায় সবল। ছেলেদের দুটো আলাদা এক্স্ এবং ওয়াই বলে দুর্বল এবং ছেলে হলে বাঁচতোই না।

রাজার কানে উঠতে রাজা বদ্দিকে জিজ্ঞাসা করলেন—এ কী কথা শুনছি!

বদ্দি বললেন—ওরা স্থূল কথাটা বলছে, সাধারণ সমীক্ষার কথা বলছে, কিন্তু ভেতরের কথা কিসুু জানে না।

—স্থূল কথাটা আবার কী?

—যৌন ক্রোমোজোম জোড়া ডবল এক্স্ হওয়ায় মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে বেশী কষ্ট সহ্য করতে পারে এবং মৃত্যুর হারও ছেলেদের চেয়ে কম।

রাজা শঙ্খমালাকে খুশিমনে গ্রহণ করলেও গ্রহণ করতে পারলেন না মন্ত্রী, পাত্র-মিত্র, প্রজা, এমনকি স্বয়ং রানীমাও। সেদিন মন্ত্রীকে সাথে নিয়ে রাজা অন্তঃপুরে মেয়ে দেখতে গেলে পরিচারিকারা বললো—রানীমা সবসময় মুখটাকে হাঁড়ির মত করে আছেন। মেয়েকে কোলে নেন না, আদর করেন না, এমনকি ফিরেও তাকান না একবার।

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন—এ তোমার কেমন ব্যবহার রানী!

রানী মুখটাকে আরও গোমড়া করে বললেন—ও মরুক!

রাজা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—এ আবার কেমন কথা !

রানী এবার কেঁদে উঠলেন। মিনতির সুরে বললেন—মহারাজ ! ঐ মেয়েকে নিয়ে থাকলে বংশটা লোপ পেয়ে যাবে। আপনি এখনই সুয়োরানী ঘরে আনুন, ঘর আলো করা ছেলে আসুক, মেয়ে নয়—কিছুতেই নয়।

মন্ত্রীমশাই বললেন—রানীমার যুক্তিই ঠিক। হবে না—কত বড় রাজবংশের মেয়ে !

রাজা ম্লান মুখে বললেন—এত সুন্দর মেয়ে আমার শঙ্খমালা ! সুয়োরানী ঘরে এলে ওকে কী চোখে দেখবে ভেবেছো ?

রানী বললেন—যত সুন্দর হোক, ও মেয়ে। ওর স্থান পরের ঘরে। খাওয়াও, দাওয়াও, মানুষ কর। শেষে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াও কোন রাজপুত্তুরের খোঁজে। পছন্দ কেউ করলো তো অর্ধেক রাজ্য যৌতুক দিয়ে ভিখিরি হও। পছন্দ না করলে সারাজীবনের গলগ্রহ। না, মেয়েকে আদর দিও না, ও মরলেই ভাল।

রাজা ভারি গলায় বললেন—তুমি মা হয়ে মেয়ের মরণ কামনা করছো। ও বেচারার দোষ কী ?

রানী কেঁদে উঠলেন। বললেন—করছি কী সাধে ! বুঝতে পারবে মেয়ে বড় হলে।

রাজা অবজ্ঞার হাসি হাসলেন। বললেন—সে ভাবনা আমার, তোমার নয়।

রানী পাল্টা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তোমরা বুঝবে না মেয়েদের দুঃখ। রাজার মেয়ে, রাজার ঘরের বউ, রাজার মাকেও মানিয়ে চলতে হয়, ভয়ে ভয়ে কাল কাটাতে হয়, দস্যু তস্করের কবলেও পড়তে হয়।

বছর ঘুরে এলো। রানী হঠাৎ একদিন মারা গেলেন। ঘুমাতে ঘুমাতেই। সহস্র পরিচারিকার কেউ বুঝতে পারলো না রানী কখন মরলেন, কেন মরলেন ! বুড়ো বদ্দি রানীমার মৃতদেহ পরীক্ষা করে বললেন—রানীমার মানসিক উদ্বেগ ছিল, সেই উদ্বেগ থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল হার্টের অসুখ। কেউ জানতে পারেনি, রানীমাও জানাননি কাউকে। শেষে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় মারা গেছেন।

রানীর শোকে সবাই কাঁদলেন। শুধু চোখের জল ফেললেন না রাজা। রানীর শবদেহের সৎকারের আদেশ দিয়ে প্রাসাদ সংলগ্ন এক

বাগানে শঙ্খমালাকে কোলে নিয়ে তাকিয়েছিলেন আকাশের দিকে। ঠিক সেইসময় এক অনুচর ছুটতে ছুটতে এসে দাঁড়ালো রাজার সামনে। অভিবাদন জানিয়ে বললো ঃ মহারাজ! আপনার প্রিয় চিড়িয়াখানায় যে চিতাবাঘের জোড়াটা ছিল তার একটি মারা গেছে। মারা গেছে বাঘিনীটাই। রেখে গেছে দুটি কচি কচি বাচ্চা।

রাজা গুম হয়ে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। পরে বললেন রানীর শবদেহ সৎকারের সময় চিড়িয়াখানার একদিকে ঐ বাঘিনীর মৃতদেহটাকেও কবর দিও।

অনুচর বললো ঃ বাঘিনীকে খাঁচা থেকে কিছুতেই বার করানো যাচ্ছে না। বাঘটা মৃত বাঘিনী আর বাচ্চা দুটোকে আগলে বসে আছে। ওপাশে রাশি রাশি খাবার দেওয়া সত্ত্বেও নড়ছে না।

রাজা ভ্রূ কোঁচকালেন। বললেন—ঘুমের ওষুধ পোরা বুলেট ফুটিয়ে বাঘটাকে ঘুম পাড়িয়ে দাও। আর এক্ষুনি খুঁজে আনো আর একটা বাঘিনীকে। বাঘের ঘুম ভাঙার আগেই কাজটা করো কিন্তু।

—কিন্তু এখনই এমন একটা বাঘিনীকে কোথায় পাওয়া যাবে মহারাজ!

রাজা ভাবলেন একটু। বললেন—শিকারীদের পাঠিয়ে গোটা কয়েক বাঘিনীকে ধরে আনো। আর যতক্ষণ বাঘিনী ধরা না পড়ছে ততক্ষণ বাঘকে ঘুম পাড়াবার এবং মৃত বাঘিনীকে সরাবারও প্রয়োজন নেই।

পরদিন সকালে রাজা গেলেন চিড়িয়াখানায় বাঘের খবর আনতে। একসময় বাঘটার খাঁচার কাছে আসতেই চটেমটে আগুন হলেন। তখনও খাঁচার ভেতরে মরা বাঘিনীটা পড়ে আছে। কিন্তু বাঘটা তাকে আগলে বসে নেই। খাঁচার অপরপ্রান্তে লেজ আছড়াচ্ছে আর গোঁ গোঁ করছে। দুটি বাচ্চা মহানন্দে খেলা করছে তার ঘাড়ের উপর। আঁচড়াচ্ছে, কামড়াচ্ছে, কখনও বা তার লেজের উপর লাফিয়ে পড়ছে।

রাজা অনুচরটির দিকে কটমট করে তাকালেন। তারপর কঠোরস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—এতক্ষণ বাঘিনীটাকে কেন সরানো হয়নি! শিকারীরা কী এতই অকর্মণ্য হয়ে পড়েছে? নাকি রাজার আদেশেরও তোয়াক্কা রাখে না।

অনুচরটি কাঁদো কাঁদো হয়ে বললো—মাপ করবেন মহারাজ! মরা বাঘিনীকে কাল রাতেই সরিয়ে আনা হয়েছে। এটি নতুন বাঘিনী।

বিস্মিত রাজা জিজ্ঞাসা করলেন—এটি আবার মরলো কেমন করে?
—ঐ বাঘটাই মেরে ফেলেছে।
—সে কি?
—আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ! ঘুম থেকে জেগে উঠেই বার দুই শ্বাস নিয়ে বাঘটা যেন লাফিয়ে উঠলো। সামনে নতুন বাঘিনীটাকে দেখে একবার মাত্র রাগে গর গর করে উঠেছিল। তাঁর পরেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বাঘিনীর উপর। মুহূর্তের ভেতরেই কেটে দিয়েছে ওর গলনালীটা।

রাজা চিন্তিত হলেন। বুঝলেন, নতুন বাঘিনীকে সহ্য করতে পারছে না বাঘটা। মৃদু হাসলেন রাজা। অনুচরকে জিজ্ঞাসা করলেন—অন্য কোন বাঘিনী ধরা পড়েনি?
—ধরা পড়েছে মহারাজ!
—তাহলে ঐ বাঘিনীটাকে সরিয়ে নাও। আর বাঘের চোখের সামনে অন্য একটা খাঁচায় বাঘিনীকে পুরে ওর খাঁচার দেওয়াল ঘেঁষে রেখে দাও।

একমাস ধরে রাজ্যে শোকপালন করা হলো। তারপর যথারীতি শুরু হলো রাজসভার কাজ। জমে ওঠা কাজগুলোকে শেষ করতেও কেটে গেল একমাস। কাজকর্ম সাঙ্গ হওয়ার পর একদিন মন্ত্রীমশাই রাজাকে বললেন—মহারাজ! এবার সেই পুরনো প্রসঙ্গটা একবার ভেবে দেখবেন কী?

—কোন্ প্রসঙ্গটা বলুন তো? জিজ্ঞাসা করলেন রাজা।
—দেশে দেশে ভাটদের পাঠাবার ব্যবস্থা কী এখনই করবো?
রাজা চুপ করে রইলেন। মন্ত্রীমশাই পুনরায় যেন আপনমনেই বললেন– রানী না থাকলে রাজাকে মানায় না, রাজ্যকেও না। আপনি সম্মতি দিলে এখনই মায়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই।
রাজা মৃদু হাসলেন। বললেন—কোন্ দেশে রাজকন্যার ছড়াছড়ি শুনি? এ বয়সে এবং একটা সতীন কাঁটা—আমার আদরের শঙ্খমালাকে দেখেও মেয়ে দিতে আসবে?
অর্থপূর্ণ হাসি হেসে মন্ত্রীমশাই বললেন—রাজার আবার বয়স হয় নাকি! আপনি জানেন না, এই দু-মাসে দশটা দেশের রাজকন্যার খবর এসেছে।
চোখ দুটো কপালে তুলে রাজা বললেন—তাই নাকি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ! শুধু খবর আসা নয়, প্রচণ্ড অনুরোধও এসেছে। বিশেষ করে কেশনগরের সেই সোনার বরণী কেশবতী রাজকন্যা আপনার জন্যই অপেক্ষা করে আছে।

রাজার বিস্ময় বেড়ে গেল। জিজ্ঞাসা করলেন—দেশে দেশে এত রাজকন্যা!

মন্ত্রীমশাই বললেন—অর্থবান, গুণবান পাত্রের জন্য মেয়ের অভাব কোনকালে হয় না। মেয়েরা যেন মিছিল লাগায়।

রাজা হাসলেন মৃদু মৃদু। বললেন—কেশবতী রাজকন্যা না হয় এলো, কিন্তু শঙ্খমালার কী হবে?

নতুন রানীমা যাতে শঙ্খমালাকে অনাদর করতে না পারে তার জন্য সব রকমের ব্যবস্থা করা যাবে। শঙ্খমালার জন্য হাজার দাস-দাসী থাকবে, সাতমহলা বাড়ী থাকবে, হাজার হাজার প্রজার স্নেহ থাকবে, আর কী চাই!

—আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নেবেন না তো!

মন্ত্রীমশাই কিচ্ছুটি বললেন না। রাজা ভেবে চিন্তে বললেন—নতুন রানীতে কাজ নেই। আমার পরে শঙ্খমালাই দেশ শাসন করবে।

শান্তকণ্ঠে মন্ত্রীমশাই বললেন প্রজারা মেয়ের শাসন মানবে তো?

রাজা ভাবলেন অনেকক্ষণ। বললেন—আগে ঐ বাঘটার কথা ভাবি আসুন। তারপর নিজেদের কথা ভাবা যাবে।

দিন, মাস, শেষে বছরও গড়িয়ে গেল। তবু নতুন বাঘিনীটাকে কিছুতেই সহ্য করতে পারলো না বাঘটা। বাঘিনীও আসেনা খাঁচার পাশে। যখনই তার উপর বাঘের দৃষ্টি পড়ে তখনই রাগে গরগর করে, লেজের ঝাপটা লাগায়, না হয় খাঁচার রডগুলোকে কামড়াতে থাকে।

বাঘিনীটা খাঁচার এপারে পেছন ঘুরে পড়ে থাকে-মড়ার মত। নড়ে না, চড়ে না, বাঘটার দিকে তাকাবার কোন আগ্রহও প্রকাশ করে না। খায়, দায়, আর পড়ে থাকে।

বাঘের খাঁচা থেকে বাচ্চা দুটোকে তখনও সরানো হয়নি। তারা অনেক বড় হয়েছে। তবু বাঘ তাদের আদর করে, কাছে নিয়ে ঘুমায়, কখনও বা খেলায় মেতে উঠে। শুধু বেশী বিরক্ত করালে দাঁত খিঁচিয়ে গরগর করে। যেন বলে—অ্যাই, বেশী আনন্দ ভালো নয়, সব সময় হৈ হল্লাও নয়।

সব শুনে রাজা একদিন মন্ত্রীমশাইকে সঙ্গে করে হাজির হলেন চিড়িয়াখানায়। বাঘটা তখন খাঁচার ভেতরে শুয়েছিল আর বাচ্চাদের চাটছিল। মন্ত্রীমশাই রাজাকে বললেন—মহারাজ, ও বাঘটার কিসসু হবে না। ও এইভাবেই থাক। এবার আমি কেশবতী রাজকন্যার খোঁজ নিই।

রাজা ভাবলেন মনে মনে। বনের পশুতে যা পারে, আমি তা পারবো না! সুয়োরানী ঘরে এনে শঙ্খমালাকে কষ্ট দেওয়া কেন? ও পড়াশোনা করুক, শরীর চর্চা করুক, প্রজাদের সুখ দুঃখের কথা জানুক!

মন্ত্রীমশাইকে বললেন—আমি একবার দেশভ্রমণে যাবো। ফিরে এলে অবশ্যই ভাববো আপনার কথা। আপাতত আপনিই রাজ্যের দেখাশোনা করতে থাকুন, শঙ্খমালাকে মানুষ করার ভার নিন, আর ঐ বাঘিনীটার জন্য নতুন একটা বাঘ এনে দিন। পুরানো এই বাঘটার যাতে অযত্ন না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখবেন।

রাজা সেদিন রাতে শঙ্খমালাকে খুব করে আদর করলেন, পাশে নিয়ে ঘুমোলেন এবং ভোরবেলায় শঙ্খমালা গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়তেই গোপন সুড়ঙ্গ পথে রাজপ্রাসাদ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

পরদিন সকালে সবাই অবাক। বন্দীদের গান থেমে গেছে, প্রাসাদের ঘাঁড়তে সকালের প্রথম প্রহর উত্তীর্ণ হওয়ার ঘণ্টা বেজে গেছে, রাজসভা লোকজনে গমগম করছে, তবুও রাজার দেখা নেই। রাজার ঘুমানোর ঘরে মন্ত্রী এলেন, সেনাপতি এলেন, নগররক্ষক এলেন। সহস্র পরিচারিকা পূর্ব থেকে চন্দন, চামর, ধূপ, পুষ্প সবই হাতে করে প্রস্তুত। কিন্তু দোর খোলে না।

মন্ত্রীমশাই কী ভেবে দরজায় একটু চাপ দিলেন। দরজা খুলে গেল। সবিস্ময়ে দেখলেন সবাই, রাজার পালঙ্কে শঙ্খমালা শুয়ে আছে—রাজা নেই। অথচ রাজার পোষাক-আসাক সবই ঠিকঠাক আছে। আছে মুকুট, আছে মণিমুক্তাখচিত হারগুলো, সোনা বাঁধানো নাগরা জুতো, এমনকি ঘোড়াশালে তাঁর প্রিয় লাল ঘোড়াটাও।

মন্ত্রীমশাই বুঝতে পারলেন, রাজা সাধারণ মানুষের ছদ্মবেশেই বেরিয়ে গেছেন, কিন্তু কী যে উদ্দেশ্য, কিছুই বুঝতে পারলেন না। সভাষদদের জানিয়ে দিলেন, রাজা নিজের চোখে প্রজাদের সুখ-দুঃখ দেখার জন্য অতি সাধারণ মানুষের বেশে বেরিয়ে গেছেন। ফিরতে তাঁর দেরি হবে।

মাসখানেক অতিবাহিত হয়ে গেল। রাজা ফিরলেন না। মন্ত্রীর যত রাগ সবই পড়লো ঐ দু-বছরের দুধের মেয়ে শঙ্খমালার উপরে। তাঁর ধারণা, ঐ মেয়েটার জন্যই রাজা নতুন করে রানী আনতে চাইছেন না। শেষে বিবাগীও হয়েছেন এরই কারণে।

একদিন ডাকলেন বুড়ো বদ্দিকে। বললেন—এত্তটুকুন এই মেয়েটার জন্য রাজ্য ছারখারে যেতে বসেছে, দেখেছেন কী?

বদ্দি মাথা নেড়ে বললেন—কই না তো?

মন্ত্রী বললেন—ঐ মেয়েটার জন্যই রাজা দ্বিতীয় রানী আনছেন না।

রাজার পরে কে বসবে সিংহাসনে, ঐ মেয়েটা?

বদ্দি বললেন—ক্ষতি কী?

মন্ত্রী বললেন—তা হয় না। মেয়ের শোভা ঘরের কোণে, বাহিরে নয়।

—তাহলে?

—ঐ মেয়েটাকে এবং চিড়িয়াখানার ঐ চিতাবাঘটাকে কৌশলে পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে—যেন কাকপক্ষীতে টের না পায়। ঐ মেয়েটাকে সরানোর ভার আপনি নিন, আর চিতাবাঘটাকে আমি। বুড়ো বদ্দি আঁৎকে উঠলেন। বললেন—মানুষের জীবনদান করাই আমার পেশা, মেরে ফেলা নয়।

মন্ত্রীমশাই বললেন—দেশের বৃহত্তম স্বার্থে একটি মৃত্যু আপনাকে ঘটাতে হবে। আর আপনি যদি সম্মত না হন, তাহলে কৌশলে ঐ মেয়েটা সমেত আপনাকেও সরিয়ে ফেলবো।

—আমাকে কেন? জিজ্ঞাসা করলেন বুড়ো বদ্দি।

—হত্যার কোন সাক্ষী রাখতে নেই বলে। তবে হ্যাঁ, কাজটা কৌশলে যদি হাসিল করেন, তাহলে আপনাকে অঢেল অর্থ দেবো এবং আপনার নিরাপত্তার সমূহ ব্যবস্থাও গ্রহণ করবো—যাতে রাজা এলে কোন সন্দেহ প্রকাশ করতে না পারেন।

বুড়ো বদ্দি ভাবলেন অনেকক্ষণ। তারপর হাসি হাসি মুখে বললেন—ভেবে দেখলাম আপনার কথাই ঠিক, শাস্ত্রেও বলেছে, লক্ষ লক্ষ মানুষের কল্যাণে একজনের মৃত্যু দোষের হয় না।

মন্ত্রী এবার বুড়ো বদ্দিকে আবেগে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন—দেরি নয়, যা করবার আজই করুন।

বুড়ো বদ্দি বললেন—আপনি আজই রটিয়ে দিন, রানীর আগের ছেলেদের মত শঙ্খমালার শরীরটা একেবারে হলদে হয়ে গেছে।

বদ্দির সব বিদ্যে সারা হয়ে গেছে, ও আর বাঁচবে না। আগামীকাল সকালে ওর মৃতদেহটার গায়ে হলদে রঙ লাগিয়ে প্রজাদের সামনে তুলে ধরবেন।

মন্ত্রীমশাই বললেন—সত্যই আশ্চর্য বুদ্ধি আপনার।

শঙ্খমালার অসুখের খবর পেয়ে পরদিন সকালে প্রজারা ভেঙে পড়েছে প্রাসাদে। মন্ত্রীমশাই ছুটে গেলেন অন্দরে। কিন্তু তন্ন তন্ন করে খুঁজেও না পেলেন শঙ্খমালার দেখা, না পেলেন বুড়ো বদ্দিকে। ক্রুদ্ধ হয়ে মন্ত্রী ছুটলেন শঙ্খমালার প্রধানা পরিচারিকার কাছে। জিজ্ঞাসা করলেন—শঙ্খমালা কোথায়?

পরিচারিকা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললো—বুড়ো বদ্দি শঙ্খমালাকে রাতে নিয়ে গেছেন, ফিরিয়ে দিয়ে যাননি।

—কেন ফিরিয়ে দেয়নি, সে খবর নিয়েছো?

—আজ্ঞে না, বুড়ো বদ্দি সারারাত কাছে রাখবেন বলেই নিয়ে গেছেন।

মুখটা বিকৃত করে মন্ত্রীমশাই বললেন—বুড়ো বদ্দি নিয়ে গেল, আর অমনি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকা হলো?

—রাজার আদেশ যে এই ধরনের।

—রাজার আদেশ? কী আদেশ ছিল রাজার?

—বুড়ো বদ্দি শঙ্খমালাকে চাইলেই দিয়ে দিতে হবে। কারণ জিজ্ঞাসা করতে পারবো না।

মন্ত্রী ছুটলেন বুড়ো বদ্দির ঘরে। দেখলেন ঘর খোলা। বিছানার উপর পড়ে আছে একখানা চিঠি। এক নিঃশ্বাসে পড়ে গেলেন চিঠিটা। বুড়ো বদ্দি লিখেছেন, "শঙ্খমালাকে নিয়ে গোপন সুড়ঙ্গপথে রাজ্য ছেড়ে চলে গেলাম। সে পথের নিশানা রাজা ও আমি ছাড়া কেউ জানে না। রাজা ফিরে এলে জানাবেন, শঙ্খমালাসহ আমি মারা গেছি। নতুন রানী এনে রাজাকে সুখে রাজত্ব করতে বলবেন। যদি রাজা শঙ্খমালাকে ভুলতে না পারেন এবং নতুন রাণী না আনেন, তাহলে রাজার তৃপ্তির জন্য তখনই শঙ্খমালাকে তাঁর হাতে তুলে দেবো। আমিও আপনার মত রাজার হিতৈষী জানবেন। আর জানাবেন, কোনদিন কেউ শঙ্খমালার খোঁজ পাবে না।

মন্ত্রীমশাই এবার কিছুটা আশ্বস্ত হলেন। পরিচারিকার সঙ্গে গোপনে শলাপরামর্শ করে একটা কাঠের পুতুলকে ভালভাবে শঙ্খমালার সাজ পরিয়ে এবং দেহের অনাবৃত অংশে হলুদ রঙের প্রলেপ পরিয়ে মহাসমারোহে প্রজাদের সামনে চন্দন কাঠের চিতায় তুলে দিলেন।

গ্রাম-গঞ্জ থেকে শহরে-বন্দরে রাজা চললেন পায়ে হেঁটে। সাধারণ এক কুলির বেশে। মাথায় মুকুট নেই—পাগড়িও নেই। পায়ে জুতো নেই, গায়ে পোশাকের বাহার নেই, কোমরে নেই তরোয়াল। এক্কেবারে আদুড় গা। কোমর থেকে হাঁটু অবধি একফালি মোটা কাপড়, কাঁধে তেল চিটচিটে একটা গামছা, মুখভর্তি দাড়ি-গোঁফ, ঘাড়ে একটা ছোট্ট পুঁটুলি। চিনতে পারে কার সাধ্য!

রাজার খাবারের যাতে অসুবিধে না হয় তার ব্যবস্থা বুড়ো বদ্দি করে দিয়েছেন। শরীরকে পুরোপুরি ঠিক রাখতে, সব রকমের রোগ থেকে মুক্ত থাকতে, স্ফূর্তি বজায় রাখতে ভাল ভাল খাদ্য থেকে মূল উপাদান-গুলোকে পৃথক করে ছোট ছোট পিল তৈরি করেছেন এবং সেই পিল-গুলো একটা বোতলে পুরে রাজার হাতে দিয়েছেন। দিনে মাত্র একটা পিল খেলেই ক্ষিধে তেষ্টা পালায়, রোগব্যাধি বিশ হাত দূরে থাকে পেটভরে খাওয়ারও দরকার হয় না, দরকার হয় না মলমূত্র ত্যাগের। রাজা নিয়মত দৈনিক একটা করে পিল খান, কুলিকামিনদের সাথে দিব্যি গপ্পো করেন, আর খবর নেন তাদের ঘরের কথা, তাদের ছেলেমেয়েদের কথা, তাদের সুখ-দুঃখের কথা।

বছর কেটে গেল। রাজা ভাবলেন, সাধারণ মানুষের কথা তো অনেক জানলাম। এবার নিতে হবে মধ্যবিত্তদের হাঁড়ির খবর। কিন্তু কেমন করে?

অনেক ভেবেচিন্তে রাজা চাকর সাজলেন। ঠিকে চাকর, অল্প বেতন, খেতে দেওয়ার বালাই নেই। লুফে নিল মধ্যবিত্তরা। দশ জায়গায় দশ মাস কাটিয়ে দিলেন রাজা। ওদের দেখে রাজার সত্যসত্যই বড় দুঃখ হলো। বেচারারা বাহিরের ঠাট বজায় রাখতে দারিদ্র্যকে ঢেকে চলে। খাটার অভ্যেস নেই, সাধারনের সাথে মিশতে পারে না, পারে না বড়দের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলতে। একেবারে যেন ত্রিশঙ্কুর অবস্থা।

ওদের ছেলেমেয়েদের দেখে আরও দুঃখিত হলেন রাজা। খাটা-খাটুনির মানসিকতা নেই, লেখাপড়া শিখে মানুষও হতে পারছে না।

অপুষ্টির শিকার সবাই। অক্টোপাসের মতো জড়িয়ে ধরেছে, সংস্কার, সামাজিক বাঁধন ও নানা বিধি নিষেধ।

রাজা একসময় গরীব ও মধ্যবিত্তদের তুলনা করতে গিয়ে দেখলেন, মূর্খ ও সহায়সম্পদহীন হলেও দরিদ্ররা বরং সুখী। ছোট ছোট মেলেমেয়ে থেকে বড়রা সবাই দুপয়সা রোজগার করতে চায়। সব পরিবেশে অভ্যস্ত, সামাজিক বাঁধন শিথিল, কোন আবেগ—কোন চিন্তা গ্রাস করতে পারে না, সংস্কারের ধারও ধারে না। হৈ-হল্লা ও আনন্দ প্রকাশ করতে ওদের জুড়ি নেই।

দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করে এবার রাজা সমাজের উপরের মহলের খবর সংগ্রহ করতে বড় বাড়ীর চাকর সাজলেন। পাক্কা দুটি মাস কারও বাড়ীর দারোয়ানের কাজ করলেন, কারও বাড়ীর ঝাড়ুদার, কারও বাড়ীর বা তল্পিবাহক। কিন্তু ওদের বাড়ীর হাজার আলোর ঝলকানির ভেতরে কারও মনের থৈ খুঁজে পেলেন না। শুধু এইটুকুই বুঝলেন, ঐ দরিদ্রদের মত দরিদ্র তাদের পারিবারিক বাঁধন, ততোধিক দরিদ্র তাদের নীতিবোধ ও মানসিকতা।

দুমাসেই যেন হাঁপিয়ে উঠলেন রাজা। সেই সঙ্গে দেশভ্রমণ তাঁর সাঙ্গ হলো।

রাজ্যের উপান্তে নিবিড় এক বনে ভাঙা মন্দিরের ভেতরে প্রবেশ করলেন রাজা। এইখান থেকেই রাজার শোয়ার ঘর পর্যন্ত সুড়ঙ্গপথ। উভয় মুখ পাথরের খিলান দিয়ে বন্ধ। একটা ছোট্ট ফুটোর ভেতরে লোহার রড ঢুকিয়ে জোরে চাপ দিলেই সুড়ঙ্গের মুখটা খুলে যায় এবং সুড়ঙ্গের ভেতরে প্রবেশ করলে আপনিই বন্ধ হয়ে যায় মুখটা।

সুড়ঙ্গে প্রবেশ করার আগে একটু পা ছড়িয়ে বসলেন রাজা। দু-বছর ধরে তিনি ঘুরেছেন, কত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, মাথায় মুকুট না থাকায় সবার কাছাকাছি আসতে পেরেছেন, এবার তাঁর সমূহ অভিজ্ঞতাকে নির্জন মন্দিরে বসে পাশাপাশি সাজাতে শুরু করলেন। রাজ কাজে ডুব দিলে এমন সুযোগ আসবে না।

কতক্ষণ পরে তাঁর চিন্তা অন্যখাতে বইতে শুরু করলো। মনের কোণে ভেসে উঠলো তাঁর প্রাসাদের ছবি, শঙখমালার ছবি আর বুড়ো বদ্দি ও মন্ত্রীর ছবি। শঙখমালার কথা মনে হতেই কেমন যেন ব্যাকুলতা অনুভব করলেন। শঙখমালাকে যখন ছেড়ে এসেছিলেন তখন তার মুখে

আধো আধো বুলি এসেছিল। আজ দু-বছরে সে নিশ্চয়ই অনেকখানি বেড়ে উঠেছে, ভালভাবে কথা বলতে পেরেছে, হয়ত বা শুরু করেছে লেখাপড়া শিখতে।

আর দেরি করতে ইচ্ছে হলো না রাজার। ধড়ফড় করে উঠতে যাবেন —এমন সময় দেওয়ালের গায়ে এক উইঢিবিতে ঠেকলো তাঁর পা। মুহূর্তে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়লো ঢিবিটা। আচমকা এমন একটা ঘটনা ঘটায় রাজা একটু আনমনা হয়ে পড়লেন।

এক সময় তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো অনাবৃত ঢিবিটার উপর, দেখলেন, পেট মোটা উই রানী খোশ মেজাজে তখনও ডিম পেড়ে চলেছে! কর্মী ও রক্ষীরা রানী ও ডিমের পরিচর্যায় ব্যস্ত। আর গোটা চারেক পুরুষ এদিকে ওদিকে কুঁকড়ে বসে আছে, অবহেলায় অনাদরে। লাখ লাখ কর্মীর কেউ একজনও ফিরে তাকানোর প্রয়োজন অনুভব করছে না।

রাজা হাসলেন মনে মনে। বুঝি বা বললেন—আহা বেচারা পতঙ্গ-জগতের পুরুষ, তোমাদের কোন অধিকার নেই। তোমরা উইরা বরং বেঁচে থাকার অধিকার পেয়েছো, অপরাপর পতঙ্গদের পুরুষ তাও পায় না।

রাজার কেমন যেন দয়া হলো। তিনি একটি পুরুষ উইকে ধরে দলের মধ্যে ছেড়ে দিলেন। না, সহ্য করলো না রানী—কর্মীরাও। বেচারা পুনরায় যেন সেঁধিয়ে পড়েতে চাইলো।

আপন মনে হাসলেন রাজা। অদ্ভুত ওদের রানীর মর্জি—একচ্ছত্র সাম্রাজ্ঞী। ফেরোমনের গন্ধ ছড়িয়ে কোটি কোটি প্রজাকে বশে রেখেছে!

পরক্ষণে তাঁর মনে এলো, পতঙ্গ-জগতের মত তিনিও ব্যতিক্রম ঘটাবেন —শঙখমালাকে দেবেন রাজ্যের ভার। মন্ত্রী, সেনাপতি থেকে কোটি প্রজা তারই আজ্ঞাধীনে থাকবে—ভাঙবেন চিরাচরিত নিয়ম।

রাত্রির অন্ধকারে গোপন সুড়ঙ্গপথ দিয়ে আপন শয়নকক্ষে প্রবেশ করলেন রাজা। ভোর হতে আর দেরি নেই। রাজা শুরু করে দিলেন হাঁকডাক। ছুটে এলেন মন্ত্রী, ছুটে এলেন সেনাপতি, ছুটে এলেন নগর রক্ষক, পাত্র, মিত্র, সভাসদ। শুধু এলেন না বুড়ো বদ্দি এবং শঙখমালাকে কোলে নিয়ে প্রধানা পরিচারিকা।

রাজা শঙখমালার জন্য সাত রাজ্য থেকে সাতশ' রকমের খেলনা এনেছেন, কত নতুন নতুন পোশাক এনেছেন, কত গয়নাগাঁটি, কত খাবার-

দাবার। মন্ত্রীমশাইকে বললেন—শঙখমালাকে এক্ষুণি নিয়ে আসুন আর খবর পাঠান বুড়ো বদ্দির কাছে।

মন্ত্রীমশাই কান্নায় একেবারে ভেঙে পড়লেন। ডুকরে কেঁদে উঠলেন সেনাপতি, নগররক্ষক, পাত্র, মিত্র সবাই। রাজা বার দুই ভ্রূ-কোঁচকালেন। বললেন—কান্নাটা অবসর সময়ের জন্য তুলে রাখুন। খুলে বলুন কী হয়েছে।

মন্ত্রীমশাই চোখের জল মুছতে মুছতে বললেন—মহারাজ, শঙখমালা আর নেই।

রাজার পায়ের তলা থেকে যেন মাটি সরতে শুরু করলো—যেন একটা প্রবল ভূকম্পন অনুভব করলেন পায়ের তলায়। তথাপি যথেষ্ট ধৈর্য অবলম্বন করে জিজ্ঞাসা করলেন কী হয়েছিল শঙখমালার ?

—আপনার যাওয়ার মাসখানেক পরে রানীমার আগের ছেলেদের মত শঙখমালার শরীরটা হলদে হতে থাকে। তারপর জ্বর। সাতদিনের দিন মারা গেল সে।

—বুড়ো বদ্দি ?

—শোকে, দুঃখে আত্মহত্যা করেছেন বদ্দিমশাই।

রাজা গুম হয়ে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন —চিড়িয়াখানার সেই বাঘ ?

—বাঘটা মারা গেছে, বাচ্চা দুটো আছে। তারা বড় হয়ে যাওয়ায় নতুন বাঘিনীর বাচ্চাদের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে।

কতক্ষণ পরে রাজা জিজ্ঞাসা করলেন--বুড়ো বদ্দির ঘরটা কী খোলা পড়ে আছে ?

না, তালা দিয়ে রেখেছি।

চাবিটা দিন। আর আজকের সভার কাজ বন্ধ রাখুন। একটু একা একা থাকতে চাই আমি।

বুড়ো বদ্দিকে রাজা যে ঘর দিয়েছিলেন সেখান থেকে ও একটি গোপন সুড়ঙ্গপথ রাজার শয়নকক্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই পথটির নিশানাও রাজা ও বদ্দি মশাই ছাড়া কেউ জানতেন না। এই পথে রাতে বুড়ো বদ্দি আসতেন, রাজার সঙ্গে গোপন শলাপরামর্শ করতেন এবং প্রতিদিন রাতে রাজার শরীরটাকে পরীক্ষা করতেন।

রাজা সভার কাজ স্থগিত রেখে শয়নকক্ষে প্রবেশ করে দরজায় খিল

দিলেন। তারপর সুড়ঙ্গপথে এগিয়ে গিয়ে বদ্দিমশাইর ঘরে প্রবেশ করলেন। দেখলেন, ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ। ভ্যাপসা গন্ধ থেকে বুঝতে পারলেন বহুদিন ঘরটা ব্যবহার করা হয়নি। পাছে কেউ এসে ঘর খোলে এই ভয়ে তিনি ভেতর থেকেও ছিটকিনিটা তুলে দিলেন।

রাজা আলো জ্বালালেন, জিনিসপত্রগুলো ভালভাবে লক্ষ্য করলেন, যন্ত্রপাতিগুলোও পরীক্ষা করলেন। অবশেষে মেঝের একজায়গায় পায়ের গোড়ালি দিয়ে জোরে জোরে আঘাত করলেন। আঘাতের পরে একটা পাথর একটুখানি সরে গেল। দেখা গেল এক সরু ছিদ্র। রাজা ছিদ্র পথে মস্ত বড় এক চাবি ঢুকিয়ে ঘোরাতেই বেরিয়ে এলো একটা পাথরের দেরাজ। দেরাজের উপর একটা শীলকরা খাম দেখে তাড়াতাড়ি হাতে তুলে নিলেন রাজা। ঠিক এইটিই আশা করেছিলেন তিনি।

দুরু দুরু বুকে খাম খুললেন রাজা। তারপর পড়ে গেলেন এক নিঃশ্বাসে। সংক্ষিপ্ত চিঠি। বদ্দিমশাই লিখেছেন—

মহারাজ! আপনি ফিরে এলে আমার এবং শঙ্খমালার খোঁজ করতে নিশ্চয়ই এই গোপন প্রকোষ্ঠে হাত দেবেন। প্রথমে জানাই যে মন্ত্রী-মশাই আপনার এবং আপনার রাজ্যের একান্ত শুভানুধ্যায়ী। যেহেতু আপনি দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করতে সম্মত নন, তাই মন্ত্রীমশাই-র ধারণা—ঐ শঙ্খমালাই একমাত্র প্রতিবন্ধক। তার প্রতি আপনার অত্যধিক বাৎসল্য আপনাকে নতুন রানী আনয়নে বিরত করিয়েছে।

মন্ত্রীমশাইর আরও ধারণা ছিল শঙ্খমালাকে গোপনে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে পারলে আপনি পুনরায় দার পরিগ্রহ করতে বাধ্য হবেন। আমি ডাক্তার এবং বিদেশী ভেবে আমার হাতে দিয়েছিলেন শঙ্খমালার হত্যার কাজ।

ওতে লাভই হয়েছে। আমি শঙ্খমালাকে নিয়ে গোপন পথ দিয়ে পালাতে পেরেছি। শঙ্খমালাকে সুখেই রাখবো এবং আমার সমূহবিদ্যা তাকে দান করবো। তাছাড়া মাতৃগর্ভে থাকা কালে ওর সমস্ত ত্রুটি দূর করেছি, মস্তিষ্ক যাতে সুগঠিত হয় তার ব্যবস্থা করেছি এবং নীরোগ ও দীর্ঘায়ু যাতে হয় তারও ব্যবস্থা করেছি। কেউ হত্যা না করলে ও বুদ্ধিবলে অসাধ্যকে সাধন করতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস। আমি তা দেখবোও। আমাদের জন্য আদৌ ভাবনাচিন্তা করবেন না। যথা সময়ে শঙ্খমালা হাজির হবে আপনার কাছে।

আপনার কাছে আমার একটি অনুরোধ, প্রজার মনোরঞ্জনের জন্য

আপনি পুনরায় বিয়ে করুন। এইখানেই আছে যন্ত্রপাতি এবং ওষুধ-পত্র। প্রজারা যেহেতু মেয়ের শাসন চায়না, তাই নতুন রানীর গর্ভে সন্তান এলে পরীক্ষা করে দেখবেন। যদি মেয়ে আসে তাহলে বোতলে রাখা ওষুধ ভ্রূণের দেহে প্রয়োগ করবেন। তাহলেই মেয়ে ছেলেতে পরিণত হবে।

বোতলে যথেষ্ট ওষুধ আছে, খাতায় আছে ওষুধ তৈরির ফরমূলা ও প্রয়োগ বিধি। যদি দেরি হয়, তাহলে ওষুধ খারাপ হয়ে যেতে পারে। ঐ কারণে ফরমূলাটা রেখে গেলাম।

রাজা হাসলেন মনে মনে। বুকের হাহাকার নিমেষে নির্বাপিত হলো। অপরদিকে বদ্দিমশাই ও মন্ত্রীমশাইয়ের প্রতি আস্থা আরও বেড়ে গেল।

পরদিন ভোরে রাজা সভায় বসলেন। বেশ হাসি-খুশি। মন্ত্রীমশাই ভাবলেন, রাজা শোকটাকে কাটিয়ে উঠেছেন। বুকে বল পেয়ে রাজাকে বললেন—মহারাজ! দুঃখ-শোককে যাঁরা সহজে কাটিয়ে উঠতে পারেন, তাঁরাই প্রকৃত প্রাজ্ঞ।

রাজা আড়চোখে মন্ত্রীমশাইদের দিকে একবার তাকিয়ে চোখটা নামিয়ে নিলেন। তারপর হাসতে শুরু করলেন মৃদু মৃদু। মন্ত্রী আরও সাহস পেলেন। অনুনয়ের সুরে বললেন—মহারাজ! কেশবতী সেই রাজকন্যা আজও আপনার পথ চেয়ে বসে আছে।

রাজা হাসলেন। জিজ্ঞাসা করলেন—আর কোন রাজকন্যা বসে নেই!

—আছে মহারাজ! সাত সাতজন! ওদের ছবি দেখতে চান?

—না, ছবির প্রয়োজন নেই। সাতজন কন্যাদায়গ্রস্ত রাজাকেই উদ্ধার করবো। ভাট পাঠান।

মন্ত্রী খুশি হয়ে হাঁক-ডাক শুরু করলেন, সেনাপতি-নগররক্ষক তৎপর হয়ে উঠলেন, পাত্র-মিত্ররা গোঁফে তা দিতে শুরু করলেন। রাজা পুনরায় মন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন—আপনার এবং প্রজাদের নির্দেশ আমি মেনে নিলাম। সেই সঙ্গে আমারও একটা আদেশ মানতে হবে আপনাদের।

—কী আদেশ মহারাজ!

রাজা বললেন—আমি দেশে দেশে ঘুরে যা দেখেছি, তাতে মনে হচ্ছে কোন রাজ্যের মানুষ মেয়ে চায় না। সবাই চায় ছেলে। তাই ঘোষণা

করুন, আজ থেকে আমার রাজ্যের কোন মায়ের যেন কন্যা সন্তান না হয়।

—সে কেমন করে হবে মহারাজ! মেয়ে হলে কী হত্যা করা হবে?

—না, না, এমন কাজ করবেন না।

—তা হলে?

—যে কেউ মা হতে পারে তাকে এইখানে—আমাদের গবেষণাগারে পরীক্ষা করিয়ে নেবেন। যদি কন্যা আসে, তাহলে উপযুক্ত ওষুধ প্রয়োগের মাধ্যমে তাকে ছেলেতে পরিণত করবেন। যত ওষুধ লাগে সবই সরবরাহ করা যাবে।

মন্ত্রী মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললেন—কিন্তু!

—না, কোন কিন্তু নয়। আপনার কথা যখন মেনে নিয়েছি, তখন আমার কথাও মানতে হবে। দেশে ঘোষণা করে দিন, যার মেয়ে হবে তাকে কঠিন শাস্তি গ্রহণ করতে হবে।

—পরিণামের কথাটা ভেবে দেখেছেন মহারাজ!

—অবশ্যই ভেবেছি। খুব বেশি করে ভেবেছি বলেই এই নির্দেশ দিলাম।

মন্ত্রীমশাই হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন রাজার মুখের পানে। কিন্তু রাজার কোন ভাবান্তর হলো না।

সাত সাত রানীকে ঘরে আনলেন রাজা। ঊনপঞ্চাশটা মহল তৈরি হলো, সাতশ' পরিচারিকাকে নিয়োগ করা হলো এবং সাত রাজ্যের হীরে-মানিক দিয়ে ভরিয়ে দেওয়া হলো রানীমহলগুলো। খুশি হলেন মন্ত্রী, খুশি হলেন সেনাপতি, খুশি হলেন প্রজারা, এমনকি খাদ্যের পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়ায় ঘোড়াশালে ঘোড়া এবং হাতিশালে হাতিরাও খুশি হলো।

সবচেয়ে বেশী খুশি হলো মনে হয় পরিচারিকারা। তারা এতদিনে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। রাজার যখন একটিমাত্র রানী ছিল, তখন রানীমহলে ঝগড়াঝাটি ছিল না। তাদের সময় কাটতে চাইতো না আদৌ। একের দুর্নাম অপরের কাছে ছড়িয়ে বাড়তি সুযোগ পাওয়া যেতো না, অন্য রানীর কাছে দোহাই দিয়ে একটু জিরিয়ে নেওয়া যেতো না, প্রশংসার মাধ্যমে মূল্যবান উপহার লাভ করারও উপায় ছিল না। তবুও মন্দের ভাল ছিল। এক রানী হলেও পুজো-আচচায়, রানীর জন্মদিনে কিংবা

রাজবাড়ীর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যাই হোক কিছু উপহার পাওয়া যেতো। রানীমা মারা যাওয়ার পর থেকে তাও উঠে গেছে। এতদিনে সাত রানী সাত সাতটি পূর্ণিমার চাঁদের মত মহলগুলোকে আলোয় আলোয় ভরিয়ে দেওয়ায় তাদের মনের আঁধার দূর হলো, উপরি পাওনার লোভে রানীদের খুশি করতে তৎপর হয়ে উঠলো, আর রানীদের গুণগানে মুখর হয়ে উঠলো।

রাজ্যের ঠাকুর দেবতার ভোগের পরিমাণও বেড়ে চললো হু হু করে। আজ এ রানী পুজো দিতে যান তো কাল সে রানী—পরের দিন আর এক রানী। রানীদের ইচ্ছায় ভোগের পরিমাণ চতুর্গুণ হলো, মন্দিরের দেওয়ালে দেওয়ালে নতুন করে রঙ পড়লো এবং বিগ্রহের গায়ে সোনাদানা উঠলো। রানীদের ভক্তি দেখে প্রজা সাধারনের ভক্তিও ক্রমান্বয়ে বেড়ে চললো।

সুযোগ এলো গণৎকারদেরও। রাজা আদৌ আমল দিতেন না ওদের। রাজার দেখাদেখি রাজপুরুষেরাও না, প্রজারাও না। গণৎকারদের বিদ্যেতে তাই জং ধরেছিল, পুঁথিকে উইতে কেটেছিল, শেকড়বাকড়ে ঘুণ ধরেছিল, এবং রঙ-বেরঙের পাথরগুলো জৌলস হারিয়ে ঘরের কোণে গড়াগড়ি খাচ্ছিল।

এবার সাত সাতজন রানী দিনে দশবার হাত গণাতে শুরু করায়, রাজাকে বশে এনে সুয়োরাণী হতে চাওয়ায় এবং রাজমাতা হওয়ার স্বপ্নকে সার্থক করতে চাওয়ায় তাদের ব্যবসা উঠলো তুঙ্গে। জলের দামে কেনা ঝুটা পাথর হীরের দামে বিক্রি করে পাকাবাড়ী হাঁকালো শহরে আর ছেলেদেরও নিয়োগ করলো ব্যবসায়।

একরকম সারা রাজ্যেই খুশির বান ডেকে গেল। ধোপা-নাপিত, মুটে-মালী থেকে কামার-কুমোর, স্বর্ণকার-মণিকার সবাই দুটো পয়সার মুখ দেখলো—যেন প্রাণ ফিরে পেলো দেশটা।

ততদিনে বুড়ো বদ্দি শঙ্খমালাকে নিয়ে কত গ্রাম—কত নগর পেরিয়ে, কত তেপান্তরের মাঠ ডিঙিয়ে, কত মরু কত পাহাড় অতিক্রম করে পৌঁচেছেন নিজের দেশে—সেই সাত সাগর ও তের নদীর ওপারে। বুড়ো বদ্দির সাত কুলে কেউ নেই। অথচ আছে প্রাসাদের মত বাড়ী, দেশ-জোড়া সুনাম এবং অঢেল টাকা পয়সা।

বুড়ো বদ্দি হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ায় এবং এতকাল ফিরে না

আসায় রাজ্য জুড়ে শোকের ছায়া নেমেছে। বৈদ্য তো নয়, যেন সাক্ষাৎ দেবতা। মড়াও যেন একবার কথা বলে। ধনী-দরিদ্র সবারই ছিলেন বাপ-মা। বিনি পয়সায় রোগী দেখতেন, নিজের হাতে সেবা করতেন, প্রয়োজন হলে গরীবদের সাহায্যও করতেন। টাকার তাঁর অভাব ছিল না। ভিন দেশের রাজরাজড়াদের রোগ সারিয়ে যে টাকার পাহাড় জমিয়েছিলেন তার কণামাত্রও শেষ করতে পারেননি।

বুড়ো বদ্দি ফিরে আসায় রাজ্য জুড়ে খুশির আমেজ উপচে পড়লো। তাঁকে অভিনন্দন জানাতে রাজা এলেন, রানী এলেন, এলেন কাতারে কাতারে প্রজা। তারা শঙ্খমালাকে দেখলো, আদর করলো, খেলনা ও গয়না-গাঁটি দিল। জিজ্ঞাসা করলেন—এমন ফুটফুটে মেয়েকে কোথায় পেলেন বদ্দি মশাই।

বুড়ো বদ্দি বললেন—সাত রাজ্য ঘুরে জোগাড় করেছি এমন একটি মাণিককে। শঙ্খদ্বীপের রাজার মেয়ে—নাম শঙ্খমালা। আমার সব বিদ্যে ওকে দেবো বলে এনেছি। বড় হলে এই শঙ্খমালাই তোমাদের ভার নেবে।

—আপনার বিদ্যে আর কাউকে দেবেন না? জিজ্ঞাসা করলেন একজন।

বুড়ো বদ্দি বললেন—নেওয়ার ক্ষমতা কারও ভেতরে দেখতে না পেয়ে দেশ-ভ্রমণে গিয়েছিলাম। অনেক খুঁজে পেতে শেষ পর্যন্ত ওকেই পেয়েছি। আশাকরি ওর যত্ন-আত্তি সবাই করবে।

সবাই একসঙ্গে বললো—সে আমাদের বলতে হবে না। শঙ্খমালা আমাদের সবার মেয়ে।

বুড়ো বদ্দি রাজার মেয়ে শঙ্খমালাকে রাজার হালেই রাখলেন। প্রজাদের কাছ থেকে দূরেও সরিয়ে আনলেন না। এই বয়স থেকেই সে প্রজাদের সঙ্গে বনে বনে, পাহাড়ে-পাহাড়ে, নদী-ঝর্ণার কূলে কূলে ঘুরে বেড়াতে লাগলো; ফুল-পাখী, গাছপালা, কীটপতঙ্গ সবার সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলতে শুরু করলো; মানুষের ভালমন্দ, দুঃখ-দারিদ্র্য, হাসি-উল্লাস প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেল। সারা পৃথিবীটা যেন তার আবরণ উন্মোচন করলো শঙ্খমালার কাছে।

শঙ্খমালা আরও বড় হয়ে উঠেছে। সে এখন রীতিমত পড়াশোনা করে, দৌড়-ঝাঁপ করে, খেলাধুলাও করে। তাকে শিক্ষাদান করতে দশজন

শিক্ষককে নিয়োগ করা হয়েছে, সবার উপরে আছেন বুড়ো বদ্দি। তার উপর আছে ঘোরাফেরা, এর-তার বাড়ীতে যাতায়াত, কত কী! এক-মুহূর্তও সময় পায় না শঙ্খমালা।

তবু কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে শঙ্খমালার। কোন সময় নিরিবিলিতে থাকলে মনের কোণে ভেসে ওঠে ধোঁয়াটে কতকগুলো ছবি—কতকগুলো প্রতিমূর্তি। স্বপ্নের মত যেন মনে হয়, সে কারও কোলে অথবা কাউকে ভর করে গুটি গুটি পায়ে হাঁটছে বিরাট এক সাতমহলা বাড়ীতে। কতজনে ঘিরে আছে তাকে। কত লোক-লস্কর!

মনে পড়ে এখানকার রাজার মতই জমকালো পোশাক-পরা এক পুরুষকে। আরও আরও সুন্দর ছিলেন তিনি। সকালে বিকেলে কোলে নিতেন, কত জিনিসপত্র এনে দিতেন আর মাঝে মাঝে নিয়ে যেতেন একটা বাঘের খাঁচার কাছে।

বুড়ো বদ্দিকে শঙ্খমালা ডাকে দাদু বলে। কবে থেকে ডাকা শুরু করেছে—তা তার মনে নেই। তবে এঁরও কথা মনে পড়ে। সেই বাড়ীতে দাদুর কাছে ঘুমিয়েছে, দাদুর গলা জড়িয়ে ধরেছে, দাদুর সাথে বেড়াতেও গেছে। প্রকৃতপক্ষে এই দুটি লোকই ছিল তার কাছের মানুষ! দাদুতো কাছে আছে, কিন্তু সেই লোকটি কোথায়?

একদিন পড়তে পড়তে শঙ্খমালা আচমকা দাদুকে জিজ্ঞাসা করলো—আচ্ছা দাদু, সবার তো বাপ মা আছে—আমার কেন নেই?

দাদু গম্ভীর হলেন বললেন—তোকে জন্ম দেওয়ার একবছরের ভেতরেই তোর মা মারা গেছেন।

—বাবা?

—বাবা তোর নিরুদ্দেশ।

—আমি বাবার কাছে একবার যাবো।

বুড়ো বদ্দি হাসলেন। বললেন—তোর বাবার খবর পেলেই তোকে নিয়ে যাবো তাঁর কাছে। এখন মন দিয়ে পড়াশোনা করতো দেখি!

একটি একটি করে কুড়িটি বছর কেটে গেছে। অনেক বড় হয়েছে শঙ্খমালা। বুড়ো বদ্দি এতদিনে তাকে দান করেছেন তাঁর সমূহ বিদ্যা। অনুশীলন করতে করতে এবং বহু দেশের বহু বিদ্যাকে আয়ত্ত করে সে বদ্দিমশাইকে ছাড়িয়ে গেছে।

বদ্দিমশাই এখন অতি বৃদ্ধ। কোথাও যেতে পারেন না, চিকিৎসা

করতে গেলে ভুল হয়, বিস্মরণও ঘটেছে অনেক। তাঁর কাজটা এখন সম্পন্ন করে শঙ্খমালাই।

শঙ্খমালার মনটাও বেজায় নরম—যেন একতাল কাদা। কারও অসুখের কথা শুনলে সে চুপচাপ বসে থাকতে পারে না। সুনামও ছড়িয়ে পড়েছে দেশে-দেশান্তরে। তার সুনামে খুশি সে দেশের রাজা, প্রজা, ধনী-দরিদ্র সবাই। সবচেয়ে খুশি মেয়েরা। এই প্রথম তাদের বিশ্বাস হলো, মেয়েরা ফেলনা নয়। সুযোগ পেলে তারা বিদ্যায় ও বুদ্ধিতে পুরুষকে অতিক্রম করতে পারে।

শঙ্খমালার গৌরবে গৌরবান্বিত বুড়ো বদ্দিমশাই। তবে শঙ্খমালার বিশেষ কয়েকটা আচরণে তিনি খুশি হতে পারেননি। এখন শঙ্খমালা তার অতীতের সমূহ ঘটনাকে জেনে নিয়েছে। জেনে নিয়েছে মেয়ে হয়ে জন্মানোর জন্য তার মা শোকে দুঃখে মারা গেছেন, তার স্নেহময় পিতা তাকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করায় প্রজারা প্রতিবাদ জানিয়েছে, তারই জন্য পিতা হয়েছিলেন নিরুদ্দেশ এবং তাকে হত্যা করার চক্রান্তও হয়েছিল।

সেই থেকে কেমন যেন বেপরোয়া হয়ে উঠেছে শঙ্খমালা। মনে কেমন যেন একটা প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা, সামাজিক নিয়ম ভাঙার উৎসাহ এবং পুরুষের উপর টেক্কা দেওয়ার প্রবণতা।

বুড়ো বদ্দির মুখ থেকে তার বিগত দিনের কাহিনী শোনার কয়েক দিনের ভেতরেই সে কেটে ফেলেছে তার হাঁটু পর্যন্ত ঝুলে পড়া এক ঢাল কালো চুলকে। পুরুষদের মত না হলেও ঘাড়ের উপর চুল! অগ্নিবরণ শাড়ীটাকে ছেড়ে ধরেছে প্যান্ট আর কোট, যত অলঙ্কার ছিল সবকটিকে ফেলে দিয়ে এসেছে নদীর জলে।

বুড়ো বদ্দি প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। আফসোসের সুরে বলেছিলেন —তুই এ কী করলি মালা?

মুখটা ভার ভার করে শঙ্খমালা বলেছিল—তুমিই তো আমায় শিখিয়েছো দাদু, নারী এবং পুরুষের দৈহিক উপাদান একই। আমিও দেখেছি, উভয়ের দেহে রয়েছে সেই একই হাড়ের কাঠামো, তার উপর মাংসপেশী ও শিরা-উপশিরা, চামড়ার আস্তরণ। আভ্যন্তরীণ যন্ত্রপাতি —সেই হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, কিডনী, পরিপাকতন্ত্র প্রভৃতির মধ্যেও কোন তফাৎ নেই। শুধু কোষের যৌন ক্রোমোজোম জোড়া এবং কতকগুলো হরমোনের ক্রিয়া পৃথক করেছে মেয়েতে। এই সামান্য পার্থক্যকে উৎকট

করে তুলতে পোশাকে-আসাকে, সাজে-সজ্জায়, আচারে-আচরণে এত ঘটা কেন, বাহুল্যই বা কেন ? আমি সেই বাহুল্যকে বর্জন করেছি।

বুড়ো বদ্দি সন্তুষ্ট হতে পারেননি। ক্ষীণকণ্ঠে বলেছিলেন—জানি, তোর মনে আছে প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা। তবু নারীর নারীত্বটাকে অবহেলা করাটা কী ঠিক !

দৃপ্তকণ্ঠে বলেছিল শঙ্খমালা—নারীর নারীত্ব সহস্র সহস্র প্রজন্মের বিবর্তনের ফল এবং তার মূলে তোমাদের পুরুষ সমাজের শাসন। আমি সে নিয়ম ভাঙবো।

বুড়ো বদ্দি শঙ্খমালার বিয়েরও ব্যবস্থা করেছিলেন। ভাট পাঠিয়েছিলেন দেশে দেশে। শঙ্খমালার রূপগুণের খ্যাতি শুনে কত দেশ থেকে কত রাজপুত্র এসেছিল ময়ূরপঙ্খী সাজিয়ে। তাকে লাভ করতে, তারা অপেক্ষাও করেছিল সে-দেশের সমুদ্র নদীর ঘাটে ঘাটে এবং বন্দরগুলোতে। এসেছিল সোনার দেশের সোনার বরণ রাজপুত্র, হীরে মানিকের দেশের প্রভাতকালের শিশিরবিন্দুর মত চোখ ধাঁধানো মন ভোলানো অপরূপ রূপকুমার, কিন্তু শঙ্খমালার পছন্দ হয়নি। বলেছিল—ও রূপটা কিছু নয়, বাহিরের খোলস। চামড়াটা খুলে ফেল, সাদা-কালো কোন তফাৎ খুঁজে পাবে না।

হতাশায় একেবারে ভেঙে পড়েছিলেন বুড়ো বদ্দি। বলেছিলেন—কাজটা তুই ভাল করছিস না মালা ! বিয়ে করতে হয়, নিজেকে ছেলে-মেয়েদের ভেতর ধরে রাখতে হয়, মরণশীল জীবকে নিজের সন্তানের ভেতর দিয়ে অমরত্ব অর্জন করতে হয়।

কৌতুকে নেচে উঠেছিল শঙ্খমালার চোখ দুটো। প্রশ্ন করেছিল, তুমি যখন এত কথা জানো, তাহলে তুমিই বা জীবের ধর্ম পালন করনি কেন ?

বৃদ্ধের মুখটা সহসা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। বলেছিলেন—তার আর সময় পেলাম নারে মালা। বিদ্যা আহরণ করতে দেশে দেশে ছুটতে ছুটতে কখন ফুরিয়ে গেলাম। তাছাড়া পুরুষ মানুষের বেলায় এটি কোন ব্যাপার নয়। বংশধারা না হলেও বিদ্যের ভেতর দিয়ে চিরকাল অমর হয়ে থাকবো। বহন করবে তোমরা।

শঙ্খমালা গম্ভীর কণ্ঠে বলেছিল—আমি মেয়ে বলেই কী আমাকে বাধ্য করাচ্ছো ? কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখেছো কী ?

কোন কথাটা ? জিজ্ঞাসা করলেন বদ্দিমশাই।

—যে বিদ্যে তুমি আমাকে দান করেছো, তাকে আমায় প্রয়োগ করতে হবেই। আর প্রয়োগ করতে গেলে অন্তঃপুরে সোনার পালঙ্কে শত পরিচারিকা পরিবৃতা হয়ে বসে থাকা চলবে না এবং রাজরানী হয়ে বিদ্যাকে প্রয়োগ করতে গেলে হয় ডাইনি বলে পুড়িয়ে মারবে সবাই, নয়ত খনার মত নিজেকেই নিজের জিভ কেটে ফেলতে হবে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শঙ্খমালা পুনরায় বললে—দাদু, তুমি কী নিজেই বুঝতে পারছো না যে—তুমিই তো আমার গলায় মণিমুক্তার বদলে কাঁটার মালা পরিয়ে দিয়েছো ? ঘরের কোণ থেকে তুলে এনে বাইরে প্রতিষ্ঠিত করেছো ? মেয়ের লজ্জাকে অপসারিত করিয়ে পুরুষের বৈশিষ্ট্য দান করেছো! তার জন্য তোমাকে অবশ্য দোষ দিচ্ছি না। এই আমি বেশ আছি। পরিত্যাগ করেছি নারীর লজ্জা, নারীর সজ্জা, নারীর আভরণ। শুধু লুকাতে পারিনি গলার স্বরকে এবং ব্যাহত করতে পারিনি বিশেষ বিশেষ হরমোনের ক্রিয়াকে।

বুড়ো বদ্দি বললেন—চেষ্টা চালিয়ে যা, পারলেও পারতে পারিস। আর তুই না পারলেও একদিন না একদিন কেউ পারবে।

—আমি তো চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আর তোমার ঐ পুরুষ জাতটাকে শায়েস্তা করতে আমি যে কোন বয়সের মেয়েকে ছেলেতে রূপান্তরিত করার উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। তুমি যদি আর বিশটা বছর বেঁচে থাকো তাহলে নিজের চোখেই দেখতে পাবে।

বুড়ো বদ্দি বললেন—তাহলে যে একশ পাঁচ বছর আমাকে বাঁচতে হয়। তবে জানবি, এতে আমার অবিশ্বাস নেই। মায়ের জঠরে কম দিনের ভ্রূণকে ইচ্ছেমত ছেলে কিংবা মেয়েতে পরিণত করার উপায় আগে আবিষ্কৃত হয়ে গেছে। তেইশ বছর আগে এমন ব্যবস্থা আমিই তো রেখে এসেছি তোর বাবার কাছে। পারিনি বেশি বয়সের মেয়েকে ছেলে বানাতে। তা যদি পারতাম তাহলে তোকে মেয়ে হতে হতো না।

বাবার প্রসঙ্গ এসে পড়ায় শঙ্খমালা কেমন যেন আনমনা হয়ে পড়লো। একসময় জিজ্ঞাসা করলো—আমার বাবার কোন সংবাদ পেয়েছেন কী ?

বুড়ো বদ্দি হাসলেন। বললেন—বরাবর তাঁর খোঁজ নিয়ে আসছি। তিনি ভালই আছেন। তবে তাঁর সব কথা এখনও তোকে বলিনি। বলবো এবার।

শঙ্খমালা অধীর আগ্রহে দাদুর গলা জড়িয়ে ধরে নিতান্ত কচি

খুকিটির মত আবদারের সুরে বললো—বল, বল, দাদু! কেন তুমি গোপন রেখেছো!

দাদু বললেন—তোমার বাবা নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন সত্য, তবে দুবছর পরেই ফিরে এসেছেন। তারপর প্রজাদের সন্তুষ্ট করতে একটি পুত্র সন্তানের জন্য এনেছেন সাত সাত রানী।

শঙ্খমালা ছোট মেয়ের মতই আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠলো। বললো কী মজা! কী মজা! আমার তাহলে অন্তত সাতভাই আর আমি বোন চম্পা!

বুড়োবাদ্দি গম্ভীর হলেন। বললেন—সাত রানীর কারোও কোলে সন্তান আসেনি। এখন তোর বাবা তোরই প্রতীক্ষা করছে। আরও মজার কথা, তোর প্রতি প্রজাসাধারনের ঘৃণার প্রতিশোধ তুলতে তিনি তার রাজ্যে কোন মেয়েকে জন্মাতে দেননি। অর্থাৎ বিশ বছরে একটিও মেয়ে জন্মেনি তাঁর রাজ্যে। শুধু ছেলে, ছেলে আর ছেলে।

—তারপর? বিস্ময়ে চোখগুলো বড় বড় হয়ে গেল শঙ্খমালার।

—একটি প্রজন্ম মেয়ে না আসায় রাজ্যের সে এক সাংঘাতিক অবস্থা! ঘর সামলাতে, শিশুপালন করতে, রান্না-বান্নার কাজ করতে কোন মেয়ে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বিজ্ঞাপন দাতা, যাত্রা থিয়েটার সিনেমা, আর ধনীদের মাথায় হাত, মধ্যবিত্তদের উঠেছে নাভিশ্বাস এবং গরীবরা নিঃশেষ হতে চলেছে। ছেলেদের বিয়ে দেওয়ার জন্য রাজ্যে মেয়ে নেই। ধনীরা আগে যৌতুক নামে ছেলেদের বিয়েতে যে অঢেল অর্থ ঘরে আনতো তার শতগুণ ব্যয় করতে হচ্ছে ভিন রাজ্য থেকে মেয়ে আনতে।

শঙ্খমালা জিজ্ঞাসা করলো—রাজার মনের ইচ্ছা কী আজও পূর্ণ হয়নি।

—পুরোপুরি হয়নি। প্রজাদের বিস্তর মিনতিতে রাজা আদেশ প্রত্যাহার করে নিয়েছেন বটে, তবে শর্তও আরোপ করেছেন।

—কী সেই শর্ত?

—শর্ত অনুযায়ী রাজ্যে পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার। যৌতুক প্রথা লুপ্ত। মাথার চুল থেকে পোশাক পরিচ্ছদ উভয়ের সমান হবে এবং অলঙ্কার নিষিদ্ধ। সোজা কথা তোমার রাজা হওয়ার পথকে তিনি পরিষ্কার করে ফেলেছেন।

—আমি যে ফিরে যাবো—এমন নিশ্চয়তা কোথায়? তিনি তো জানেন আমি মৃত। তাহলে?

—তুমি যে জীবিত এবং একদিন যে তুমি বাবার কাছে ফিরে যাবে এমন নিদর্শন আমি যে নিজেই রেখে এসেছি। তুমি যে সুদীর্ঘ পরমায়ু লাভ করবে—এমন আশ্বাসও দিয়ে এসেছি আমি।

শঙ্খমালার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। ক্ষণকাল ধরে কী যেন ভাবলো সে। তারপর বললো—বাবাকে দেখতে বড়ো সাধ আমার! তাই বলে আপনার বিচ্ছেদও সহ্য করা আমার পক্ষে কঠিন।

বুড়ো বদ্দির চোখ ছাপিয়ে জল এলো। বললেন—তুমি যত বড় হচ্ছো ততই বুকটা আমার হাহাকার করে উঠছে। সেই প্রথম থেকেই জানি আমি, তোমাকে ছেড়ে দিতেই হবে। তবু এমন এক কঠিন মায়ার বাঁধনে বেঁধেছো আমাকে—যাকে মন থেকে মুছে ফেলা যায় না। আর কদ্দিন বা বাঁচবো, মরার পরে যেও তুমি।

—তুমিও কেন চল না আমার সঙ্গে! বাবা খুশি হবেন এবং আমাকে চিনতে কোন অসুবিধা হবে না।

বুড়ো বদ্দি বললেন—তোমাকে অবশ্যই চিনতে পারবেন। সে বংশের নিয়ম অনুযায়ী শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার বাম হাতের চেটোর তলার দিকে একটা ছোট্ট শঙ্খের চিহ্ন এঁকে দেওয়া হয়। দ্যাখ, তোমার হাতেও আছে।

—তুমি তাহলে যাবে না?

পঁচাশি বছরের বৃদ্ধ কী পথের কষ্ট সহ্য করতে পারবে?

তোমাকে সঙ্গে না নিয়ে আমি যাচ্ছি না।

বুড়ো বদ্দি হো হো করে হেসে উঠলেন। হাসি থামিয়ে বললেন—যেতে পারি একটিমাত্র শর্তে।

—কী তোমার শর্ত?

—তোমাকে বিয়ে করতে হবে সেই হীরে মানিকের দেশের রাজপুত্রকে।

শঙ্খমালা হাসলো। বললো—বিয়ে যদি করতে হয়, তাহলে রাজ্য হাতে এলেই করবো।

বুড়ো বদ্দি মুখখানা ভার করে বললেন—তোমার বাবা ভারি একরোখা। তোমাকে দেখতে পেলে কী যে করে বসবেন বা কী যে খেয়াল চাপবে তাঁর—বলা বড় শক্ত। তাই আগে থেকে বিয়ের ব্যাপারটা চুকে বুকে যাক।

শঙ্খমালা বললো—আমাকে একটু ভাবতে দাও দাদু! মাসখানেক পরে জবাব দেবো।

এক মাসের জায়গায় তিনমাস কেটে গেল, শঙখমালা বিয়ের প্রসঙ্গ আদৌ উত্থাপন করলো না, বাবার কাছে যাওয়ারও কোন লক্ষণ প্রকাশ করলো না। বুড়ো বদ্দি চিন্তিত হলেন। শরীরের অবস্থাও দিন দিন খারাপ হয়ে চলেছে, যে কোন দিন তাঁর পরপারের ডাক পড়তে পারে। তার জন্য দুঃখও নেই তাঁর। দীর্ঘকাল পৃথিবীর জলবায়ু ভোগ করেছেন, সহস্র সহস্র মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়েছেন, আর কী চাই! এবার অনিবার্যকে বরণ করে নিঃশেষ হতে চান—জরাগ্রস্ত শরীরটাকে আর যেন টানতে পারছেন না।

তাঁর একটিমাত্র বাঁধন শঙখমালা। ঐ বাঁধন থেকেও মুক্তি পেতে চান তিনি। গচ্ছিত ধনকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বিশ্বস্ত বন্ধুর মত হাসিমুখেই তুলে দিতে চান তিনি। সে ধনের কণামাত্রও তিনি আশা করেন না। তথাপি তাঁর দুঃখ শঙখমালাকে পরিপূর্ণ করতে পারলেন না।

সেদিন সন্ধ্যায় বুড়ো বদ্দিমশাই তাঁর প্রিয় বাগানটিতে বসে একা একা ভাবছিলেন শঙখমালার কথা। শেষবারের মত শঙখমালাকে জিজ্ঞাসা করবেন। শঙখমালা যদি কথা না রাখে, তাতেও তিনি দুঃখিত হবেন না, বাধ্যও করাবেন না শঙখমালাকে। আনন্দের সঙ্গেই তাকে পাঠিয়ে দেবেন তার বাবার কাছে।

সহসা শঙখমালার ডাক শুনে যেন চমকে উঠলেন তিনি। সন্ধ্যায় নীড়ে ফেরা পাখীর কাকলির মত শঙখমালার হাসি ভেসে এলো। দেখলেন, একটা বানরকে গলায় দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে আসছে আর হাসিতে উপচে পড়ছে। কাছাকাছি হতে শঙখমালা বললো—আমার চ্যবনকে দেখ দাদু, আমার চ্যবন!

দাদু বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—চ্যবন আবার কে?

—এই যে, তোমার পোষা সেই বুড়ো বানরটা।

বদ্দিমশাই ভাল করে তাকালেন বানরটার দিকে। তারপর বললেন —বেশ নাদুস-নুদুস দেখাচ্ছে তো! যত্ন-আত্তি করে খুব করে খাওয়াচ্ছো বুঝি! নামটাও বেশ ভাল রেখেছো, চ্যবন!

—হ্যাঁ দাদু, এক্কেবারে যুবা হয়ে গেছে। আমার এই চ্যবনের জন্য এবার একটা সুকন্যার খোঁজ করতে হবে।

—তা যা বলেছো! অনাবিল হাসিতে ফেটে পড়লেন বুড়ো বদ্দি।

শঙখমালা কিন্তু আদৌ হাসলেন না। বরং কৃত্রিম গাম্ভীর্যে ভরে

গেল তার মুখমণ্ডল। একসময় বললো—এবার আমি বিয়ে করবো।

—বিয়ে করবি! আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন বুড়ো বদ্দি। বললেন—তাহলে এক্ষুনি আমি ঘটক পাঠিয়ে দি!

মৃদু হাসলেন শঙ্খমালা। বললো—এক্ষুণি নয়, পরে।

—আবার পরে! গলায় বিরক্তির সুর ফুটে উঠলো বুড়ো বদ্দির!

শঙ্খমালা আড় চোখে তাকিয়ে বললো—কথায় বলে, লাখ কথা না হলে বিয়ে হয় না। এখন তো কথা বলতে শুরু করলাম মাত্র। ঘরে চলো—আলোচনা করবো।

বুড়োবদ্দিই কথা শুরু করলেন। আবেগ ভরা কণ্ঠে আরও নিবিড় হয়ে বললেন—তুই আর অবাধ্য হোস নে মালা! কথা দে, কাল সকালেই একটা রাজকুমারকে ধরে আনি। আমার অঢেল সোনা-দানা, মণিমুক্তা আছে; তোর বাবার বিরাট রাজ্য আছে, তোর নিজের আছে প্রচুর বিদ্যে, রাজপুত্রের অভাব হবে না।

—না।

—তাহলে তুই নিজে বুঝি কাউকে পছন্দ করেছিস্। তা হোক আমার আপত্তি নেই।

—হ্যাঁ, পছন্দ আমি করেছি। পছন্দ না করে উপায় ছিল না।

—কেন, কেন? তোকে কী খুব রূঢ় কথা বলেছিলাম! যদি বলে থাকি তাহলে কিছু মনে করিস নে! বুড়ো হয়েছি, কখন কী বলতে কী বলে ফেলি। স্মরণেও আসে না।

—না দাদু, তুমি কোন রূঢ় কথা বলনি।

—তাহলে?

—ভেবে দেখলাম, আমার এমন একজন কুমারকে দরকার যাকে ইচ্ছে মত ঐ চ্যবনের মত ঘোরাতে পারবো, যাকে শাসন-তিরস্কার করলেও কিছু মনে করবে না, আর যে সব সময় আমার অনুগত হয়ে থাকবে এবং যত্ন-আত্তি করবে।

—তেমন কুমারকে কোথায় পাবি?

—নিজের মত করে তৈরি করে নেবো।

—তাহলে রোবটই হবে।

—না, খাঁটি রক্ত-মাংসের মানুষ।

—তাহলে কৃত্রিম উপায়ে গবেষণাগারে টিউবের ভেতরে! কিন্তু ভেবে দেখেছিস, যখন তার বয়স পঁচিশ হবে তোর এখন পঞ্চাশ। তাছাড়া তুই স্রষ্টা হলে তার মায়ের পর্যায়েই পড়বি।

—এত বোকা আমি নই। তা যাক, আমি যদি তোমায় বিয়ে করি তোমার আপত্তি আছে?

হো হো করে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন বুড়ো বদ্দি। হাসি যেন থামতেই চায় না। শেষে শঙ্খমালার ধমক খেয়ে হাসি থামিয়ে বললেন —মালারে, আমার যদি বয়সটা না হতো, তাহলে কী তোকে পরের হাতে তুলে দিতাম। কবে রানী বানিয়ে ফেলতাম তোকে। আর একটা রাজ্যও জয় করে দিতাম।

গভীর কণ্ঠে শঙ্খমালা বললো—ঠাট্টা যে নয়, তার নমুনা তো সামনে দেখছো তুমি? বিস্ময় ভরা কণ্ঠে বুড়ো বদ্দি জিজ্ঞাসা করলেন—তার মানে?

ঐ বুড়ো বানর চ্যবনের কথা বলছি। তাকে যখন যুবাতে পরিণত করেছি তখন তোমাকেও করতে পারবো। পঞ্চাশ বছরেরও বেশী বয়স কমিয়ে দেবো তোমার এবং আমার বিদ্যা প্রথম তোমারই উপর প্রয়োগ করবো।

বুড়ো বদ্দির চোখ দুটো একবার নেচে উঠলো। শঙ্খমালার কথায় আমল না দিয়ে বললেন—তোর কথা শুনেই আমার বয়স বিশে নেমে গেছে। এই দ্যাখ না, আনন্দে কেমন ধেই ধেই করে নাচতে ইচ্ছে হচ্ছে!

শঙ্খমালা আরও গম্ভীর হলো। বললো—বলেছিতো, আমি তামাসা করছি না। শুধু তুমি বল, তোমার উপরে পরীক্ষা চালালে তুমি ভয় করবে না।

বুড়ো বদ্দিও গম্ভীর হলেন এবার। বললেন—এ বয়সে মরার ভয় কারও থাকে না। শরীরটাকে আর টানতে পারছিনা রে মালা, যত তাড়াতাড়ি মারা যাই ততই ভাল।

—না দাদু তোমাকে মরতে দেবো না, মরতে বলছিও না। তুমি গেলে আমি কী নিয়ে থাকবো বল? তাই তো তোমাকে আরও আরও দীর্ঘকাল টিকিয়ে রাখতে কতকাল গবেষণা চালিয়েছি এবং সফল ও হয়েছি।

বুড়ো বদ্দি অবাক হয়ে তাকালেন শঙ্খমালার দিকে। বিবর্ণ ও

পান্ডুর মুখটা তার ক্ষণেকের জন্য উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বললেন—এই ঘাটের মড়াটার জন্য তোর এখনও এত মায়া! যে বয়সে মানুষ তার নিতান্ত আপন জনের কাছেও বোঝা বিশেষ, যার সান্নিধ্য কেউ পছন্দ করে না, জীবিত থেকেও যে মরার সামিল তার প্রতি তোর এত অনুরাগ! তা যাক, তুই আমার উপর কী ধরনের পরীক্ষা চালাতে চাস—একবার বল দেখি!

—তাহলে শোন দাদু! আমি কতকগুলো পরীক্ষা থেকে বুঝতে পেরেছি, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের কোষে কোষে জলের অণু-গুলো একত্রিত হয়ে বেশ কিছু ভারী হয়ে যায় এবং সেগুলো অবাঞ্ছিত ভাবে জমে উঠে। তার উপর মাংসপেশীতে জমে চর্বির আস্তরণ। আর রক্তবহা নালীর ভেতরেও জমে ওঠে চর্বি। এতে কোষ বিভাজন ব্যাহত হয়। আমি ঐ ভারী জলকে সরিয়ে আনবো, চর্বি-গুলোকে নিষ্কাশন করবো, সক্রিয় কোষ গুলোকে উত্তেজিত করে ভালভাবে বিভাজনক্ষম করবো এবং কতকগুলো কৃত্রিম হরমোন প্রয়োগ করবো। তাতে তোমার ঐ লোল চর্ম থাকবে না, কোষ বিভাজন দ্রুততর হয়ে সুগঠিত করবে শরীর, আভ্যন্তরীণ যন্ত্রপাতি গুলোকে সক্রিয় করে তুললে সবরকমের অবসাদও দূরীভূত হবে। এককথায় বৃদ্ধ যুবাতে পরিণত হবে।

বৃদ্ধ হাসলেন। বললেন—এই সর্বনাশা কাজে হাত দিস না মালা।

শঙ্খমালা জিজ্ঞাসা করলো—কিসের সর্বনাশ!

—যদি কৃতকার্য হও, তাহলে পৃথিবীর ধনী ও স্বেচ্ছাচারীরা সহসা মরতে চাইবে না। সর্বনাশ হবে পৃথিবীর, আরও আরও বিঘ্নিত হবে প্রকৃতির ভারসাম্য, স্বেচ্ছাচার ও অনাচারে ভরে যাবে পৃথিবী।

শঙ্খমালা ভাবলো কিছুক্ষণ। বললো—এ ব্যবস্থা একদিন না একদিন উদ্ভাবিত হবেই। মানুষের অভিধান থেকে "অসম্ভব" কথাটা অনেক আগে থেকে মুছে গেছে। তবু আমি কথা দিচ্ছি, তোমার উপরই প্রথম এবং শেষ প্রয়োগ করবো। এমনকি আমার বাবাকেও যুবাতে পরিণত করতে যাবো না।

বুড়ো বদ্দি বললেন—ঠিক আছে, নির্ভয়ে প্রয়োগ করিস। যদি মরি, তাতে দুঃখ করবি না। আমার সমস্ত অর্থ তুই যা খুশি করবি এবং বাবার কাছে চলে যাবি। সেই সঙ্গে বিয়েও করবি।

শঙ্খমালা হেসে পরিবেশটা লঘু করে দিল। বললো—শঙ্খমালার

এক কথা। তোমার আদরের মালা তোমার গলায় মালা দেবে। মুখ-খানা আষাঢ়ের মেঘের মত করে বুড়ো বদ্দি বললেন—বিশেষ বিশেষ হরমোনের ক্রিয়াকে ছেলেরা প্রতিহত করতে পারলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে মেয়েরা পারে না। তার জন্য মেয়েরা অপেক্ষাকৃত বেশী একগুঁয়ে, স্বেচ্ছাচারী ও ক্ষমতা লিপ্সু। তুইও তার ব্যতিক্রম নয় বলে এমন একটা সর্বনাশা কাজে হাত দিচ্ছিস।

শঙ্খমালা তার অর্জিত নতুন বিদ্যাকে বুড়ো বদ্দির উপর প্রয়োগ করেছে পনের দিন আগে। কাজ তার শেষ, উত্তেজনা চরমে, ফল প্রত্যক্ষ করার আগ্রহে অধীর।

বুড়ো বদ্দি আচ্ছন্নের মত পড়ে আছেন বিছানায়। তাঁর দৈহিক কাজকর্মগুলো নিয়ম মাফিক সম্পন্ন হচ্ছে কিনা দেখার জন্য হরেক রকমের যান্ত্রিক ব্যবস্থার আয়োজন হয়েছে, কৃত্রিম উপায়ে খাদ্যপ্রদান করা হচ্ছে, শত পরিচারক ও পরিচারিকা পরিচর্যায় নিযুক্ত, শঙ্খমালাকে সাহায্যও করছে শত সহকারী। বুড়ো বদ্দির সারা জীবনের সঞ্চিত অর্থ ও সম্পদ শঙ্খমালা ব্যয় করে চলেছে তাঁকে যুবাতে পরিণত করতে।

পনের দিনের ভেতরেই বদ্দির দেহের পরিবর্তন এসেছে অনেকখানি। তবু শঙ্খমালার ধারণা, আরও সপ্তাহ দুয়েক এইভাবে ফেলে রাখতে হবে এবং নিউরোনগুলোর পুনর্গঠনের জন্য বিবিধ ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে।

শঙ্খমালার নিজের উপর দৃঢ় আস্থা আছে। শুধু একটি ব্যাপারে নিয়ে সে কিছুটা ইতস্তত করছে। সেটি মস্তিষ্কের নিউরোনগুলোর পুনর্গঠন পঁচাশি বছরের বৃদ্ধ বদ্দিমশাইর মাথার নিউরোনগুলো যে অনেক নষ্ট হয়ে গেছে —তা জানে শঙ্খমালা। ধীরে ধীরে বদ্দির আচরণ শিশুর মত হয়ে উঠেছিল। কোন কাজ ধৈর্য ধরে করতে পারতেন না, খেয়াল মত চলতেন, খেয়াল মত হাসতেন ও কথা বলতেন, কোন কোন সময় অল্পে বিরক্ত হয়ে উঠতেন আবার কখনও বেশ প্রাজ্ঞের মত আলোচনা করতেন। শঙ্খমালার ধারণা, মস্তিষ্ক ছাড়া শরীরের সর্বত্র কোটিতে কোটিতে যেসব স্নায়ুকোষ ছড়িয়ে আছে—যারা স্পর্শের মাধ্যমে, অনুভূতির মাধ্যমে, দৃষ্টির মাধ্যমে মস্তিষ্কে সংবাদ আদানপ্রদান করে তাদের সে ঠিক করে দিতে পারবেই এবং এর আগে বুড়ো বানরের বেলায় কৃতকার্যও হয়েছে। কিন্তু মস্তিষ্কের নিউরোন? বানরের ক্ষেত্রে তা জানা সম্ভব হয়নি।

স্নায়ুকোষগুলোর জটিল কাজকর্ম-পর্যালোচনা করতে প্রবৃত্ত হলো

শঙখলালা। জীবজগতের মাথা মানুষ এএং মানুষের মাথাটাই তাকে আলাদা করে দিয়েছে জীবজগৎ থেকে। মাথার উপাদান এক হলেও ভেতরে মস্তিষ্ক বা ঘিলুটা দেহের অনুপাতে অনেক বেশী হওয়ায় সারা পৃথিবীকে শাসন করছে সে। ঐ মস্তিষ্ক থেকেই স্নায়ুকোষ বা নিউরোন গুলো ছড়িয়ে পড়েতে সারা দেহে প্রতিটি অঙ্গে অঙ্গে।

শঙখমালা এর আগেও অনেক ভেবেছে ঐ নিউরোনগুলোর কাজাকর্ম। যখনই ভাবে তখনই রীতিমত অবাক হয়ে যায়। তাইতো তার মধ্যে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলা লাগে। কী আশ্চর্য ঐ নিউরোনের কোষ-গুলো। আকারে কিঞ্চিৎকর বড় এই প্রোটিন অণুগুলো মস্তিষ্কে খবর পাঠাতে ছুটে যায় না, চলাফেরা করে না, এমন কি নিজের স্থান থেকে এতটুকু সরে যায় না। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা লব্ধ অনুভূতি পাশের কোষটিকে জানিয়ে দেয়, পাশেরটি তার পাশের এইভাবে ইট গাদা থেকে হাতাহাতি করে ইটকে চালান দেওয়ার মত, ছোটদের রিলে রেসের হাতের লাঠিকে পর পর বয়ে নিয়ে যাওয়ার মত, বন্ধুর সঙ্গে তামাসা করতে প্রথম বেঞ্চ থেকে শেষ বেঞ্চে কলম কিংবা বইকে চালান করে দেওয়ার মত মস্তিষ্কে পৌঁছে যায়। তফাৎটা বস্তুর বদলে অনুভূতি আর হাতের বদলে তড়িতাহিত কণার প্রবাহ।

এত সহজ ও সরল কিন্তু নয়। অনেক-অনেক জটিল। আর জটিল বলেই শঙখমালার এত ভাবনা। সোজা পথের মাঝে মাঝে চৌরাস্তার মোড়ের মতো, কিংবা রেললাইনের উপর জংশনগুলোর মত বিন্যস্ত নিউরোন কোষগুলো এক এক জায়গায় জোট পাকিয়ে ফেলেছে। দু-চারটে নয়—সহস্র সহস্র পথের সঙ্গম যেন। নাম জংশন নয়—সাইপাস। সাইপাসে হরেকরকমের রাসায়নিক পদার্থের সমাবেশ। সেই রাসায়নিক পদার্থগুলোই চিনে নেয় কোথাকার সঙ্কেত এবং কোন্ পথে চালান করে দিতে হবে—জংশনে যেমন রেলগাড়ীকে রাস্তা করে দেওয়া হয়। কিন্তু অদ্ভুত এদের তৎপরতা! সেকেণ্ডের ছ'ভাগের একভাগ সময়ের ভেতরেই শত শত জংশন অতিক্রম করে খবর চলে যায় মস্তিষ্কে।

বুড়ো হলে নিউরোনের ঘাটতি ঘটে, রাসায়নিক পদার্থ নিঃসরণ ব্যাহত হয়, সঙ্কেত ধরার অবস্থানগুলো অকেজো হয়ে যায়, তাই বুড়ো বদ্দির অসংলগ্ন ব্যবহার। তার দেহটা যুবাতে পরিণত হবে ঠিকই, কিন্তু মনটা! যদি নিউরোনগুলো ঠিকঠাক না হয় তাহলে মহা কেলেঙ্কারী বাধাবে। যুবার দেহ তার বুড়োর মন! কোনদিন

সিকি পয়সার কাজ পাওয়া যাবে না, চিরটাকাল কেবল বোঝা হয়েই থাকবে।

না, বুড়ো বয়সের সব রকমের ত্রুটিকে সংশোধন করতেই হবে। উঠে পড়লো শঙ্খমালা। বদ্দির শরীরটাকে বারে বারে পরীক্ষা করলো, নিউরোনগুলোর সক্রিয়তা যান্ত্রিক উপায়ে নির্ণয় করলো এবং মস্তিষ্ককে সুগঠিত করতে আরও ব্যবস্থা গ্রহণ করলো। আরও অন্তত কিছুদিন এইভাবে আচ্ছন্ন অবস্থায় ফেলে রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো সে।

সন্ধ্যার দিকে শঙ্খমালা বসেছিল বাগানে—একা একা। বদ্দিমশাই শুয়ে থাকায় আজকাল বড্ড ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে তার। মনখুলে কারও সঙ্গে কথা বলতে পারে না, অহেতুক হাসি আর কৌতুকে ভেঙে পড়তে পারে না, গালগল্প করে সময়ও কাটাতে পারে না। এই তার প্রথম মনে হলো, বিশ্ব সংসারে তার কেউ নেই। বাপ নেই, মা নেই, ভাই নেই, বোন নেই, কেউ না কেউ না। স্রোতের মুখে একটুকরা খড়ের মত ভেসে এসেছে—আবার তাকে যেতে হবে। বাবার কাছে সে হয়ত ঠাঁই নিতে পারতো, কিন্তু বাবা তো একটিবার খোঁজ করলেন না। বদ্দিমশাইর মুখে বাবার ঠিকানা পেয়েও যায়নি সেখানে। অথচ প্রতিমুহূর্তে সে বাবার সঙ্গ চায়, বাবাকে দেখতে চায়, বাবার সুখ-দুঃখের ভাগীদার হতে চায়।

আর রাজ্যটা! না, রাজ্যের লোভ তার নেই। অজস্র মানুষের মাঝে সে হারিয়ে যেতে চায়, আর? আর ঐ বুড়ো বদ্দিটা। তার একমাত্র অবলম্বন, তার বাল্যের বন্ধু এবং যৌবনের সখাকে বার্দ্ধক্যেরও সহচর করতে চায়; দীর্ঘায়ু দান করে তার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত টিকিয়ে রাখতে চায়। সে যদি বুড়োর মতো আচরণ করে, মাথার নিউরোনগুলো যদি পুনর্গঠিত নাও হয় তাহলে ক্ষতি নেই। ক্ষতি নেই—সে যদি চিরকাল শিশুর মত সরল থেকে যায়।

ঠিক সেই সময় এক পরিচারিকা এক বিদেশীকে সঙ্গে করে দাঁড়ালো তার সামনে। বললো – এই বিদেশী এসেছে শঙ্খদ্বীপ থেকে। আপনার দর্শনপ্রার্থী।

চমকে উঠলো শঙ্খমালা। একই সঙ্গে সহস্র জিজ্ঞাসা তার মনকে ভারাক্রান্ত করে তুললো, সেই সঙ্গে কৌতূহল। বুকটাও কেমন দুরু দুরু করে উঠলো তার। ছটফট করতে লাগলো তার বাবার সংবাদ গ্রহণের জন্য।

সমস্ত কৌতূহলকে চেপে রেখে গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো শঙ্খমালা শঙ্খ-দ্বীপের নামতো আমি শুনিনি আগন্তুক! আপনার আগমনের উদ্দেশ্য জানতে পারি কী!

আগন্তুক অভিবাদন জানিয়ে বললো—শঙ্খদ্বীপের রাজার ভয়ানক অসুখ। আমরা তাঁর বিশিষ্ট অনুচররা দেশে দেশে ঘুরছি চিকিৎসকের খোঁজে। এদেশে এসে শুনতে পেলাম আপনার চিকিৎসার খ্যাতি। তাই আপনাকে জানাই, যিনি রাজার অসুখকে ভাল করে দিতে পারবেন তাঁকে লক্ষ সুবর্ণ মুদ্রা উপহার দেওয়া হবে। এই দেখুন রাজার ফরমান। শঙ্খমালা ফরমান খানা হাতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলো ভাল করে। জিজ্ঞাসা করলো—কী অসুখ রাজার!

—গলনালীর প্রচণ্ড ব্যথা, অসহ্য যন্ত্রণা, খেতে পারেন না, ঘুমাতেও পারেন না। একরকম মৃত্যুর অপেক্ষায় বসে আছেন।

শঙ্খমালা শিউরে উঠলো। বললো—আমি আজই তোমার সঙ্গে রওনা হবো আগন্তুক। তুমি অপেক্ষা কর। আমি আমার লোকজন এবং যন্ত্রপাতিগুলোকে এখনই প্রস্তুত করছি।

বদ্যি মশাইর দেখাশোনার ভার সহকারীদের উপর অর্পণ করে এবং একটা চিঠি লিখে নিজস্ব বিমানে, পুরুষ চিকিৎসকের পোশাকে, আগন্তুকের নির্দেশনায় আকাশ পথে ছুটে গেল শঙ্খমালা। শব্দের গতিবেগ নিয়ে ছুটে গিয়েও পেঁছিলো পরদিন সকালে। আগন্তুক ছুটে গেল খবর দিতে আর শঙ্খমালা অপেক্ষা করলো রাজসভার-সম্মুখে বিদেশীদের আসনে।

রাজসভা বটে, কিন্তু সভার জৌলস নেই—লোকজনও নেই। মন্ত্রী, সেনাপতি, পাত্র-মিত্র, সভাষদ, প্রজা—একজনও নয়। প্রধান তোরণ দ্বার রুদ্ধ, রুদ্ধ খাজাঞ্চীখানা, তোষাখানা। সেপাই সান্ত্রীর হাঁক ডাক নেই, প্রজাদের চিৎকার চেঁচামেচি নেই, বিদেশীদের আনাগোনাও নেই। নহবৎ খানায় সানাই বাজছে না, বন্দীশালায় বন্দীরা প্রভাতি গান ধরছে না, রাজকবিরা নতুন নতুন কবিতা নিয়ে ছুটেও আসছেন না। চারদিকে অখণ্ড এক নীরবতা যেন পাতালপুরীর ঘুমন্ত কোন প্রাসাদ।

কতক্ষণ পরে আগন্তুক স্বয়ং মন্ত্রীমশাইকে সঙ্গে করে হাজির হলেন। বয়সের ভারে ন্যুব্জ এক দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ ব্যক্তি। কণ্ঠকে মোলায়েম করে জিজ্ঞাসা করলেন—কে তুমি?

শঙ্খমালা বললো—ভিনদেশী এক চিকিৎসক। রাজাকে দেখতে চাই।

চিকিৎসকের এমন কাঁচা বয়স দেখে হোঁচট খেলেন মন্ত্রী মশাই। তার উপর গলার স্বরটা শুনেও বিস্মিত হলেন। একেবারে মেয়েলী গলা। জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার পরিচয় ?

শঙ্খমালা বললো—আমি চিকিৎসক—এইটিই আমার একমাত্র পরিচয়। অপেক্ষা করার সময় আমার নেই। যদি অনুমতি প্রদান না করেন তাহলে এখনই আমি চলে যাচ্ছি। বিমান আমার প্রস্তুত আছে !

মন্ত্রীমশাই আমতা আমতা করে বললেন—না, না ; বহুজনে দেখে যাচ্ছে, তুমিও দেখবে—এতে অনুমতির কী আছে। চল আমার সঙ্গে রাজার কাছে।

শঙ্খমালা বললো—বিমানে আমার প্রচুর যন্ত্রপাতি আছে—লোকজনও আছে। তাদের আসতে বলুন এবং যন্ত্রপাতিগুলোকে রাজার শয়ন-কক্ষে বয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করুন।

যন্ত্রপাতির কথা শুনে বুড়ো মন্ত্রীর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। এ পর্যন্ত যে সব চিকিৎসক এসেছে—তারা মামুলি দু-চারটা যন্ত্র ছাড়া কিছুই আনেনি। খুশি হয়ে বললেন—তুমি একটুখানি বিশ্রাম কর। আমি এখনই সব ব্যবস্থা পাকা করে দিচ্ছি।

শঙ্খমালা মৃদুস্বরে বললো—আমার কতকগুলো শর্ত আছে। পূরণ করতে হবে আপনাকে। মন্ত্রীমশাই জিজ্ঞাসা করলেন—কী শর্ত তোমার ?

—রুদ্ধদ্বার কক্ষে আমি রাজাকে পরীক্ষা করবো। যথেষ্ট আলো বাতাসের ব্যবস্থা চাই, শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষ হলে ভাল হয়। আর চাই বিদ্যুতের সুব্যবস্থা। ঘরের ভেতরে আপনি ছাড়া আর কেউ থাকবে না। তাও পরীক্ষা চলাকালে কোন কথা বলতে পারবেন না আপনি।

রুদ্ধদ্বার কক্ষে সোনার পালঙ্কে শায়িত রাজাকে পরীক্ষা করতে শুরু করলো শঙ্খমালা। মন্ত্রীমশাই বসলেন রাজার পাশে-একেবারে শিয়রের কাছটিতে, সোনা বাঁধানো এক চেয়ারে। ঘর ভর্তি যন্ত্রপাতি, অঢেল সাজ-সরঞ্জাম, আর আলোকের সমারোহ। রাজা ও মন্ত্রীর চোখে ফুটে উঠলো আরণ্যক যুগের বিস্ময়, শ্রাবণের মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মত মুখের উপর খেলে গেল বিদ্যুতের প্রভা, উষর সাহারার মত বুকে সিঞ্চিত হলো

বিন্দু বিন্দু বারি। আরও বিস্মিত হলেন কাঁচা এই চিকিৎসকটির পাকা হাত দেখে। হাত তো নয়—যেন স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র, চোখ তো নয় যেন রঞ্জন রশ্মি, আর মুখটা? কঠিন, ভাবাবেশবিহীন অথচ বৃষ্টিস্নাত শতদলের মত স্নিগ্ধ।

প্রাথমিক পরীক্ষানিরীক্ষার পর শঙ্খমালা রাজাকে একটা নির্দিষ্ট আসনে বসিয়ে লেসারের মাধ্যমে দেহের ভেতরকার যন্ত্রপাতিগুলোর ত্রিমাত্রিক ছবি গ্রহণ করলো, রক্তের উপাদানগুলোর পরিমাণ নির্ণয় করলো, শেষে গলনালী থেকে একটুখানি মাংস নিয়েও পরীক্ষা করলো। ঘণ্টা-চারেক পরে মুখটা ভার করে বসলো রাজার পাশে বিছানায়। জিজ্ঞাসা করলো—মহারাজ কী ধূমপান করতেন!

মন্ত্রীমশাই উত্তর দিলেন—হ্যাঁ।

—অতিরিক্ত তেল, ঘি, প্রোটিন জাতীয় খাদ্য, মশলাপাতি?

—তাও।

—রঙ দেওয়া খাবার?

—দেখতে সুন্দর ও সুস্বাদু বলে মহারাজের এগুলো ভারি পছন্দ।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো শঙ্খমালা। মন্ত্রীমশাই জিজ্ঞাসা করলেন—রোগটা কী ধরতে পেরেছো?

—স্বরভঙ্গ, অত্যধিক যন্ত্রণা, খাওয়ার কষ্ট প্রভৃতি থেকে অনেক আগেই অনুমান করেছিলাম। এখন পরীক্ষা করে শুধু নিশ্চিত হলাম মাত্র।

—রোগটা কী?

—গলনালীর ক্যানসার।

—সারাতে পারবে?

—এ রোগের প্রতিষেধক এখনও কারও হাতে আসেনি। শুধু চিকিৎসা করে কিছুকাল টিকিয়ে রাখতে পারি মাত্র।

মন্ত্রীমশাইর মুখটা ছাইর মত সাদা হয়ে গেল। কিন্তু রাজার কোন ভাবান্তর হলো না। তিনি প্রথম থেকে কেবল শঙ্খমালার দিকে তাকিয়েই ছিলেন, চোখ ফেরাতে পারছিলেন না! তাকিয়ে তাকিয়ে আশাও যেন মিটছিল না তাঁর। গলার স্বরটা শুনেই তখন থেকে কেমন যেন উতলা হয়ে উঠেছিলেন। মুখটা যেন কতকালের চেনা অথচ স্মরণ হয় না; তার স্পর্শে এমন এক অজানা অনুভূতি যা অপর কারও স্পর্শে তিনি পাননি, সান্নিধ্যে এমন এক অনাবিল আনন্দ—যা কোনদিনই কারও কাছ থেকে

লাভ করেন নি। যেন যুগযুগান্তরের এক নিবিড় সম্পর্ক, অচ্ছেদ্য বন্ধন, হৃদয়ের যোগ। রাজা সবকিছু ভুলে তাকে কোলে টেনে নিয়ে বুকের তপ্ত জ্বালাটাকে জুড়াতে চাইলেন, কিন্তু পারলেন না।

হঠাৎ কী যেন তাঁর মনে হলো। বুকের জ্বালাও সেই সঙ্গে বেড়ে উঠলো হু হু করে। সবকিছু ভুলে গিয়ে আলতোভাবে শঙ্খমালার বাম হাতটা তুলে নিলেন বুকে। তারপর একটু টান দিয়ে খুলে ফেললেন তার হাতের দস্তানাটা। কোন আপত্তি করলো না শঙ্খমালা।

অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন রাজা শঙ্খমালার বাম হাতের চেটোর দিকে। কোন কথা তার মুখে এলো না। এই প্রথম তাঁর চোখ দিয়ে নামলো জলের ঝরণা ধারা। ঝরতে লাগলো ঝর্ ঝর্ ঝর্ ঝর্। উদ্দাম এক তটিনীর মত যে শঙ্খমালা—তারও চোখে প্রথম চিকচিক করে দেখা দিল জলের বিন্দু—বৃষ্টি ভেজা অপরাজিতার মত। রাজা যত কাঁদেন, শঙ্খমালাও কাঁদে তত। শেষে শীর্ণ বুকে রাজা শঙ্খমালাকে টেনে নিয়ে কোন রকমে উচ্চারণ করলেন—এতকাল তুই ছেলেকে কেমন করে ভুলেছিলি মা?

মন্ত্রীমশাই চোখে একরাশ বিস্ময় ঢেলে তাকিয়েছিলেন তাঁদের দিকে। কোন কথাই বলতে পারলেন না। শুধু কুড়ি বছর আগেকার একটা ঝাপসা স্মৃতি মনের কোণে টলমল টলমল করে দুলতে লাগলো।

কতদিন পরে শঙ্খমালার কাঁধে ভর দিয়ে রাজা রাজসভায় বসলেন কাঁপতে কাঁপতে। দুর্বল শরীর, বিকৃত গলার স্বর, সর্বাঙ্গে ভয়ংকর প্রদাহ। অতিকষ্টে পারিষদদের জিজ্ঞাসা করলেন—আপনাদের কী মনে আছে, আমার সেই দুবছরের ছোট্ট মেয়ে শঙ্খমালার কথা!

পারিষদরা পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে বার বার তাকালেন। মাথা চুলকাতে চুলকাতে একসময় বললেন—মনে আছে মহারাজ! আজ থেকে কুড়ি বছর আগে আপনি নিরুদ্দেশ হয়ে গেলে মেয়েটি সাতদিনের অসুখে মারা গেছে।

মৃদু হাসলেন রাজা। মন্ত্রীমশাইকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি নীরব কেন মন্ত্রীমশাই! বলুন, আমার শঙ্খমালা কী সেদিন সত্যি সত্যি মারা গেছে?

মন্ত্রীমশাই একবার রাজার মুখের দিকে আর একবার শঙ্খমালার দিকে তাকালেন। তারপর কাঁদো কাঁদো হয়ে বললেন মন্ত্রীমশাই—বুড়ো

হয়েছি মহারাজ, মিথ্যে বলবো না। আমি সেদিন ভুল খবর রটিয়েছিলাম। শঙ্খমালা মরেনি।

পাত্র-মিত্ররা অবাক হয়ে বললেন—এ আবার কেমন কথা! আমরা যে নিজের চোখে শঙ্খমালার মৃতদেহকে চিতায় তুলে দিতে দেখলাম।

মন্ত্রীমশাই বললেন—আপনারা কেউ ভালভাবে দেখেননি। চিতায় আমিই তুলে দিয়েছিলাম শঙ্খমালার সাজে একটা কাঠের পুতুলকে।

পাত্রমিত্রদের বিস্ময় আরও বেড়ে গেল। যেন আপন মনেই তাঁরা বললেন—এ যে বেজায় গোলমেলে ব্যাপার দেখছি!

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন—তার চিকিৎসক সেই বুড়ো বদ্দির কথা মনে আছে আপনাদের?

—আছে বৈকি! তিনি তো আত্মহত্যা করেছেন!

—আপনারা দেখেছেন তার মৃতদেহকে কিংবা মৃতদেহের সৎকার করতে!

—তাতো দেখিনি।

রাজা পোশাকের তলায় বুকের একখানা পাঁজরের মত বদ্দিমশাইর যে চিঠিটা এতকাল আগলে রেখেছিলেন সেইটেই বার করলেন, ময়লা, অতিজীর্ণ এবং ভাঁজ পড়া। বললেন—বুড়ো বদ্দি মরেনি। মন্ত্রীর ষড়যন্ত্রের কথা শুনে গোপন সুড়ঙ্গপথে সে শঙ্খমালাকে নিয়ে পালিয়েছিল। আমার জন্য রেখে গিয়েছিল একটা চিঠি অতি গুপ্ত একটি জায়গায়। পড়ুন সেই চিঠিটি। মন্ত্রীমশাই কেন যে ষড়যন্ত্র করেছিলেন—তাও জানতে পারবেন।

চিঠি পড়া শেষ হতেই পাত্র-মিত্ররা সমস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—শঙ্খমালা কী বেঁচে আছে?

রাজা বললেন—তোমাদেরই সামনে-আমার পাশে দাঁড়িয়ে তরুণের বেশে।

—এ তো নতুন চিকিৎসক।

—হ্যাঁ চিকিৎসকই বটে—একজন সেরা চিকিৎসক রূপে দেশজোড়া সুনাম। অথচ আমারই সেই হারিয়ে যাওয়া মেয়ে। বিশ্বাস না হয়, দেখে যাও তার বাম হাতের চেটোতে শঙ্খের ছাপ—শঙ্খদ্বীপের রাজবংশের চিরন্তন নিদর্শন।

পাত্রমিত্ররা ভাবলেন অনেকক্ষণ। তারপর বললেন—এ চিহ্ন তো নকল হতে পারে! অন্য কেউ তো চিহ্ন এঁকে শঙ্খমালা বলে চালাতে পারে!

মন্ত্রীমশাই বললেন—শঙ্খমালাকে বুড়ো বদ্দি নিয়ে যে পালিয়েছিল সে কথা আমাকেও জানিয়ে গেছে একটা চিঠিতে। রাজার দুঃসময়ে শঙ্খমালা যে হাজির হবে এমন নমুনাও পাওয়া যাচ্ছে তার চিঠি থেকে। তবে বদ্দি যখন সঙ্গে নেই তখন মেয়েটিকে আর একটু যাচাই করে দেখলে ভাল হয়।

এতক্ষণে শঙ্খমালা রীতিমত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো। বললো—আপনিই তো আমার সর্বনাশ করেছেন, আমার পিতার স্নেহ থেকে বঞ্চিত করেছেন, আমাকে পথের ভিখারী করেছেন। আজ এতদিন পরে আমাকে চিনতে পেরেও না চেনার ভান করছেন এবং আমার মুমূর্ষু পিতার কাছ ছাড়া করতে চাইছেন—শুধু মেয়ে বলেই!

অল্পক্ষণ নীরব থেকে পুনরায় শঙ্খমালা বললো—আপনারা যে সহজে স্বীকার করে নেবেন না—একথা বুড়ো বদ্দি জানতেন। তাই নমুনা হিসেবে আমার হাতে দিয়েছিলেন আপনারই নামাঙ্কিত মুক্তোর মালা—যেটি আপনি নিজহাতে পরিয়ে দিয়েছিলেন আমার প্রথম জন্মদিনে।

শঙ্খমালা পকেট থেকে মালাটি বার করে ছুঁড়ে দিল মন্ত্রীর দিকে। মন্ত্রীমশাই মালাখানা দেখেই লজ্জায় অধোবদন হলেন। বললেন—না, না, আমি অবিশ্বাস করিনি। শুধু যুক্তির কথাই বলেছিলাম।

শত শত প্রজা—যারা এতক্ষণ বসেছিল, তাদের সহসা যেন ধৈর্য্য-চ্যুতি ঘটলো। চিৎকার করে বললেন—এ অন্যায়, ঘোরতর অন্যায় করেছেন মন্ত্রীমশাই। আমাদের দেবতার মত রাজাকে চরম শাস্তি দিয়েছেন, আমাদের একটি প্রজন্মকে চরম সংকটের দিকে ঠেলে দিয়েছেন, পুত্র ও কন্যার মধ্যে আরও বিভেদ সৃষ্টি করে চলেছেন, অতএব সুবিচার চাই আমরা।

রাজা বললেন—আজকে তোমরা সবাই উত্তেজিত। বিচার আর একদিন হবে।

রাজা শঙ্খমালাকে মুহূর্তের জন্যও কাছছাড়া করেন না। চিকিৎসার গুণে কিছুটা সুস্থও তিনি। শরীর রক্ষার উপযোগী রাসায়নিক উপায়ে প্রস্তুত সুষম খাদ্য অল্পমাত্রায় লেইর আকারে খেতে দেওয়ায় অধিক খাওয়ার কষ্ট ভোগ করতে হয় না; যন্ত্রনা উপশমের ওষুধ প্রয়োগ করায় কিছুটা সময় আরামে ঘুমাতে পারেন; তেজষ্ক্রিয় রশ্মির আঘাতে ক্যানসার কোষগুলোকে পুড়িয়ে দেওয়ায় দ্রুত ছাড়িয়ে পড়তে পারছে না বলে উঠে বসেন, একটু একটু চলাফেরাও করতে পারেন। যখনই সুস্থ থাকেন

তখনই রাজসভায় যান, প্রজাদের সুখ-দুঃখের কথা শোনেন এবং রাজ্যের শুভাশুভ চিন্তা করেন।

একদিন রাজা ডাকলেন এক বিরাট সভা। হাজার হাজার প্রজা এলেন, সামন্ত রাজারা এলেন, আর এলেন রাজ্যের যত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। রাজ সিংহাসন থেকে নেমে এসে প্রজাদের মাঝখানে দাঁড়ালেন। বললেন —হে আমার প্রিয় প্রজাবর্গ! তোমরা জানো, আমার দিন প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। তাই এখন থেকেই তোমাদের শুভাশুভের ভার আমার একমাত্র মেয়ে শঙখমালার উপর তুলে দিতে চাই। তোমরা সবাই তাকে দেখেছো এবং তার দরদী মনের পরিচয় পেয়েছো। তার অসাধারণ চিকিৎসা-নৈপুণ্য, তার অসীম দয়া ও মমতা, তার সেবার মনোভাব এরই মধ্যে সবার মনকে কেড়ে নিয়েছে! রাজার মর্যাদাকে ধূলায় মিশিয়ে দিয়ে যে তোমাদের মধ্যে নেমে এসেছে, যে তোমাদের অনাথ ছেলেদের জন্য আশ্রম স্থাপন করেছে, যে সমাজের অবহেলিতদের উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, যে তোমাদের দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়ের জন্য হাসপাতালের পর হাসপাতাল গড়ে চলেছে, তাকে শাসক হিসেবে পেলে তোমরা নিশ্চয়ই আনন্দিত হবে। আমার বিশ্বাস, সে মায়ের মমতা নিয়ে পিতার স্নেহ নিয়ে, সহোদরার সাহচর্য নিয়ে সবসময় তোমাদের পাশে এসে দাঁড়াবে।

সহস্র সহস্র প্রজা করতালি দিয়ে সমর্থন জানালো রাজাকে। সমস্বরে বললো - শঙখমালা আমাদের সবার মা। মায়ের রাজত্বে মায়ের ছেলে হয়ে সুখে কাল কাটাতে চাই।

রাজা মন্ত্রীমশাইর দিকে তাকিয়ে বললেন—এবার আপনার মতটা বলুন মন্ত্রীমশাই!

মন্ত্রীমশাই বললেন—মহারাজ! আমি তো এখন যাত্রী—আপনারই মত। অনেক আগে থেকেই টিকিট কাটা হয়ে গেছে। বসে আছি শেষ খেয়ার প্রত্যাশায়। এসময় আমার মতামতের কোন প্রয়োজন নেই। প্রজাদের মতই আমার মত।

রাজা বুঝতে পারলেন মন্ত্রীমশাইর মনোভাব। মনে মনে ক্ষুণ্ণ হলেন তিনি। তারপর একে একে জিজ্ঞাসা করলেন সেনাপতি, নগররক্ষক, প্রধান দেওয়ান এবং সামন্ত রাজাদের। এঁরা কেউ বিরোধিতা করলেন না বটে, তবে সরল মনে স্বাগত জানালেন না কেউ। রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন মনে মনে। কিন্তু ক্রোধকে যথাসম্ভব দমন করে বললেন—আমি

বুঝতে পেরেছি আপনাদের মনোভাব। তবু আমি শঙ্খমালাকেই আমার উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করছি। শঙ্খমালা আপনাদের দীন মনোভাবের যোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও দেবে।

এতক্ষণে শঙ্খমালা বললো—মহারাজ, রাজ্যশাসন আমার দ্বারা হবে না। আমি রাজনীতির কিছুই বুঝি না, বুঝি না কূটনীতি, অর্থনীতি ও সৈন্য চালনা। আপনার অবর্তমানে আমি এ রাজ্যে থাকতেও চাই না। যে রাজ্যে আমাকে অবাঞ্ছিত ভেবে জন্মমাত্র পরিত্যাগ করেছে, সে রাজ্যে উপযাচক হিসেবে থাকতে চাই না। প্রজাদের জন্য যা করেছি—তা আমার জনপ্রিয়তা অর্জনের গোপন মনোভাব নয়, জন্মভূমির প্রতি কর্তব্য। আমি চাই না রাজ্য, রাজসুখ, রাজার অধিকার। সহস্র সহস্র প্রজার সামনে আমি প্রত্যাহার করে নিচ্ছি আমার দাবীকে।

মন্ত্রীমশাই যেন খুশি হলেন। বললেন—শঙ্খমালা মাকে কোন এক যোগ্য কুমারের হাতে সম্প্রদান করুন এবং তাকেই ঘোষণা করুন রাজা বলে।

শঙ্খমালা বললো—না, বিয়ে আমি করবো না। বিয়ে আমার হয়ে গেছে।

রাজা বিস্মিত হলেন, বললেন—সে কী! কোথায় আমার জামাতা! কেনই বা সে আসেনি!

শঙ্খমালা মৃদু গলায় বললো—আসার প্রয়োজন নেই বলে আসেনি। আমি নিজেই ফিরে যাবো তার কাছে।

রাজা অস্থির হয়ে উঠলেন। বললেন—বল, বল তার ঠিকানা। আমি এখনই তাকে সসম্মানে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করছি।

শঙ্খমালা ম্লান হাসি হেসে বললো—সেও চায় না রাজা হতে।

মন্ত্রীমশাই জিজ্ঞাসা করলেন—তাহলে রাজার পরে কে বসবে সিংহাসনে।

শঙ্খমালা বললো—রাজার পুত্র, আমার ভাই!

এবার রীতিমত অবাক হলো সবাই। জিজ্ঞাসা করলো—কোথায় রাজার পুত্র?

হাসলো শঙ্খমালা। বললো—অচিরেই আপনারা নিজের চোখে দেখবেন।

দিন যায়। প্রদীপ নিভে যাওয়ার আগে যেমন একবার দপ্ করে

জ্বলে উঠে আরও আরও ম্লান হয়ে ওঠে, তেমনই শঙ্খমালার চিকিৎসার গুণে সাময়িকভাবে কিছুটা সুস্থ হলেও দ্রুত অবনতির দিকে এগিয়ে গেলেন রাজা। তবু তাঁর এক গোঁ, শঙ্খমালা ছাড়া আর কারও চিকিৎসা গ্রহণ করবেন না, কারও কথা শুনবেন না, কারও ওষুধ খাবেন না। উইলও করে ফেলেছেন। এক উইলে শঙ্খমালাকে সিংহাসন দান করেছেন, অপর উইলে উল্লেখ করেছেন–শঙ্খমালার চিকিৎসায় তিনি মারা গেলেও কোন কৈফিয়ৎ দাবী করা চলবে না তার কাছে।

শঙ্খমালাও বাবা ছাড়া থাকেন না। রাতদিন বাবার সোনার পালঙ্কে মাথা রেখে চুপচাপ পড়ে থাকে, চিকিৎসা করে, নয়ত রাশি রাশি গবেষকের গবেষণার পাতা ওল্টায় এবং ডুব দেয় গহন চিন্তার রাজ্যে। নির্দিষ্ট সময়ে মন্ত্রী আছেন, সেনাপতি আছেন, রাজ্যের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরাও আছেন। শঙ্খমালা তাঁদের মামুলি অভ্যর্থনা জানায়, জোর করে ঠোঁটের কোণে হাসি টেনে এনে কথা বলে, দায়সারা গোছের তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দেয়। শুধু খুশি হয় যখন রানীমারা আসেন।

নিঃসন্তান রানীমারা এতদিনে তাঁদের ঝগড়া বিবাদ মিটিয়ে নিয়েছেন, রাজ্যের চরম দুঃসময়ে একতাবদ্ধ হয়েছেন এবং শঙ্খমালাকে আপন করে নিয়েছেন। শিবরাত্রির সলতের মত শঙ্খমালাই তাদের শেষ অবলম্বন।

রানীমারা যখন শুনলেন, শঙ্খমালা রাজ্যের ভার নিতে চায় না এবং সে যেখান থেকে এসেছিল সেইখানে ফিরে যেতে চায়, তখন আর স্থির থাকতে পারলেন না। কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এলেন শঙ্খমালার কাছে। শঙ্খমালা তাঁদের দেখতে পেয়েই ছুটে গেল, নিজের হাতে চোখের জল মুছিয়ে দিল, গলা জড়িয়ে ধরে ছোট্ট মেয়ের মত কত বায়নাও ধরলো। তারপর তাঁদের হাত ধরে টেনে নিয়ে এলো রাজার ঘরে। কিন্তু রানীমাদের কান্না যেন থামতেই চাইল না। রানীর অভিশপ্ত জীবনের প্রতি বারবার ধিক্কার জানিয়ে আরও কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

কতক্ষণ পরে বড় রানীমা—সেদিনের সেই কেশনগরের কেশবতী রাজকন্যা, জোনাকির আলোর মত যাঁর গায়ের রঙ, আঁধার রাতে শেওলা পড়া পাহাড়ের মত যাঁর চুলের ঢাল, গভীর মহাসাগরের মত স্থির যাঁর চোখের তারা, তিনিই আদর করে কোলে তুলে নিলেন শঙ্খমালাকে। বললেন – ওরে আমার আঁধার ঘরের মানিক, মরা নদীর বুকে বানের মত, মেরুর বুকে শ্যামলিমার মত, কাঠ ফাটা মাঠে সোনালী ধানের মত, সহস্র সহস্র স্বপ্নে বিভোর হয়েছিলাম তোমাকে পেয়ে। ধূমকেতুর মত

তোমার আকস্মিক আবির্ভাবে রাজপুরীতে আলোর বান ডেকে গিয়েছে তাকে আঁধারে ডুবিয়ে দিয়ে তুমি চলে যেও না মা!

বড় করুণ চোখে তাকালেন রানীমা। তাঁর চোখ দেখে শংখমালার বুকের ভেতরটা কেমন যেন মোচড় দিয়ে উঠলো। বিষাদমাখা সুরে বললো—মাগো, তুমি তো জানো মেয়ে হয়ে জন্মানোর দুঃখ কতখানি! আজ সারা রাজ্যটা মেয়ের বিহনে ছারখারে যেতে বসেছে দেখেও কেউ চায় না মেয়ের অধিকার, মেয়ের ক্ষমতা, মেয়ের শাসন। কদিন এখানে কাটানোর ইচ্ছে থাকলেও আমাকে চলে যেতে হবে।

বড় রানীমা চোখের জল মুছতে মুছতে বললেন—আমাদের তাহলে কী হবে মা? বাপের বাড়ী গিয়ে দাসীগিরি করবো?

শংখমালা চমকে উঠলো। সত্যিই তো, রানীমাদের কথা সে তো একবারও ভেবে দেখেনি? ভেবে দেখেনি, রানীমহলের হাজার জৌলুষের তলায় রানীমাদের মনের অন্ধকারের কথা। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ বলতে যাঁদের কিছু নেই, কাঁচের আলমারিতে সাজিয়ে রাখা পুতুলের মত যাঁরা অন্দর মহলের শোভাই শুধু বর্ধন করছেন, যাঁদের সুখ-দুঃখ ও হাসি-কান্নার খবর-রাখার কেউ প্রয়োজন অনুভব করে না—তাঁদের জন্য এবার মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠলো।

বাবার প্রতিও রাগ হলো শংখমালার। প্রতিশোধ গ্রহণ করতে গিয়ে সাত-সাতটি জীবনকে কেন নষ্ট করে দিলেন! এখানেও কী পুরুষের স্বেচ্ছাচার?

রাজকন্যা হয়েও রাজপুত্রকে বরণ না করায় যেন একটা আত্মতৃপ্তিও অনুভব করলো। সেই সঙ্গে পিতার প্রতি কর্তব্যের মত স্নেহশীলা জননীদের ভবিষ্যৎ নিয়েও ভাবতে শুরু করলো। বললো—হে আমার উপেক্ষিতা জননী! তোমাদের কন্যা এখনও জীবিতা। মাতৃত্বের গৌরবে যাতে গরবিনী হতে পারো তার ব্যবস্থা করবো। কোন সাধু সন্ন্যাসীর আশীর্বাদ ভিক্ষা করতে হবে না, দুশ্চর তপশ্চর্যার প্রয়োজন নেই, তীর্থে তীর্থে ধর্ণাও দিতে হবে না। সন্তানহীনার দুঃখ দূর হবে অচিরে।

গবেষণায় প্রবৃত্ত হলো শংখমালা। অনেক ভেবে একদিন রাজাকে অজ্ঞান করিয়ে তাঁর শুক্রথলি থেকে সংগ্রহ করলো শুক্রাণু। যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করলো, সবল ও সুস্থ অণুগুলোকে সংগ্রহ করলো এবং বাছাই

করে নিল পুত্র সন্তানের উপযোগী ক্রোমোজোম—তেইশের মধ্যে যার একটিমাত্র ওয়াই—বাদবাকি এক্স। হিমঘরে রেখে সেগুলোকে সংরক্ষণও করলো। সারাদিন সারারাত কেটে গেল। সকালে উঠেই শঙ্খমালা ছুটলো রানীমহলে।

রানীমহলের পাশে একটা খোলা জায়গায় পাংশুমুখে বসেছিলেন রানীমারা। সহসা শঙ্খমালাকে আসতে দেখে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো মুখগুলো। সবাই একসঙ্গে জড়িয়ে ধরলেন শঙ্খমালাকে। তারপর আদর করে খাওয়ালেন, রাজার কথা শুনলেন, আর এক এক ছড়া করে হার পাঠিয়েছিলেন শঙ্খমালার গলায়।

শঙ্খমালা মায়েদের সাথে খুব করে গপ্পো করলে। এক সময় বললো —সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছি মা, এবার তোমরা সম্মত হলেই হয়।

—কোন্ ব্যবস্থা বলতো! জিজ্ঞাসা করলেন বড় রানীমা।

মৃদু হেসে শঙ্খমালা বললে—আমি বোন চম্পা আছি, এবার সাত-সাত ভাইকে আনাবো।

পরিহাস তরল কণ্ঠে বড় রানীমা মৃদু হেসে বললেন—কারও কাছ থেকে দত্তক গ্রহণ করবো বুঝি? তুমি তো জান না মা, শত স্বর্ণপুতুলের পরিবর্তেও রক্তমাংসের গড়া পুতুল পাওয়া যায় না!

শঙ্খমালাও হেসে জবাব দিল—সেদিন কবে শেষ হয়ে গেছে। এখন কাজের কথাই বলছি। আমি পিতার শুক্রথলি থেকে শুক্রাণু সংগ্রহ করেছি। তাকে সংরক্ষণও করেছি। এবার মা, তোমাদের কাছ থেকে মাত্র একটি করে ডিম্বাণু গ্রহণ করবো। তৈরি করবো সাত সাতটে ভ্রূণ। তারপর তোমাদেরই গর্ভে স্থাপন করবো। যথা সময়ে সাত মা সাতজন ছেলে কোলে পাবেন।

বড় রানীমা বললেন—এমন অসম্ভব ব্যাপারগুলো আজকে হয় বলে শুনেছি। তবে সাতকুমারের দরকার নেই। যদু কিংবা সগর বংশের মত নিজেরা হানাহানি করে বংশ লোপ ঘটাবে। মাত্র একটি কুমার চাই!

—তাহলে সেই অনাগত কুমারকে কে ধারণ করবে মা? তুমিই ঠিক করে দাও।

বড় রানীমা বললেন—আমাদের থেকে সব থেকে যে ছোট, যে সবার আদরের এবং বয়সও কম তাকেই এই ভার দাও।

ছোট রানীমা কিন্তু বেঁকে বসলেন। বললেন—আমি পুত্র গৌরবে

গরবিনী হবো আর তোমরা কেউ হবে না – এ হতেই পারে না। বড়দিই ভার নিক, আমার কোন আপত্তি নেই। কারণ সে সবার বড়।

বড় রানীমা বললেন—না রে, এ হতেই পারে না। তোর ছেলেই হবে আমাদের ছেলে। তুই দ্বিমত করিসনে।

অপরাপর পাঁচ রানীমাও সমর্থন করলেন বড়কে। সবার পীড়া-পীড়িতে ছোট রানীমাই ভার নিলেন ভাবী কুমারের জন্মদান করতে। পরের দিনই শংখমালা ছোট রানীমার কাছ থেকে ডিম্বাণু গ্রহণ করলো। তারপর শুক্রাণু দিয়ে নিষিক্ত করালো একটি ছোট্ট টিউবের ভেতরে। কয়েকদিনের ভেতরে কোষটি যখন পূর্ণতা লাভ করলো, তখনই ছোট্ট রানীমাকে অজ্ঞান করিয়ে তাঁর গর্ভে চালান করে দিল। বাকি শুক্রাণুকে সংরক্ষণ করলো পূর্বের মত। যদি ব্যর্থ হয় তাহলে পুনরায় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে বলে।

দশটা মাস কেটে গেছে। ছোট রানীমার কোলে এসেছে এক সর্বাঙ্গ সুন্দর কুমার। কুমারকে পরীক্ষা করে পরম প্রীতিলাভও করেছে শংখমালা। বড় হলে কুমার অবশ্যই বিদ্বান, বুদ্ধিমান, ও প্রজারঞ্জক হবে এবং এর গুণপনা কিংবদন্তী হয়ে থাকবে।

এদিকে রাজার অবস্থা পর পর খারাপের দিকে মোড় নেওয়ায় তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে এক শীতল কক্ষে। ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা সহ্য করাতে করাতে সেই কক্ষের তাপমাত্রা এখন হিমাঙ্কের সামান্য উপরে। অথচ বিশেষ বিশেষ প্রক্রিয়ায় মাধ্যমে সেই ঠাণ্ডাটা রাজার সহ্য সীমার ভেতরে এসে গেছে। দেহ প্রায় জমাট বাঁধার মত, অথচ মৃত্যুমুখে পতিত হয়নি। কেবল অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছেন।

অনেক জটিল ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে শংখমালা। কৃত্রিমভাবে শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করেছে, রক্ত যাতে জমাট বাঁধতে না পারে তার জন্য পরিমিত পরিমাণে গ্লুকোজ প্রদান করা হচ্ছে, শরীরের যন্ত্রপাতিগুলো ঠিক ঠিক কাজ করেছে কিনা তার জন্যও গ্রহণ করেছে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি। গ্লুকোজ রক্তের সঙ্গে মিশছে, কোষকে খাবার সরবরাহ করছে, কোষের ভেতরে জলে দ্রবীভূত হওয়ায় কোষের জল হিমাঙ্কে পেঁছে জমাট বাঁধতে পারছে না। ক্যানসার দুষ্ট কোষগুলোও পারছে না ছড়িয়ে পড়তে।

আপাতত শংখমালার কাজ শেষ। এবার সে ফিরে যেতে চাইল বুড়ো বদ্দির দেশে। প্রবাসীর ঘরে ফেরার আনন্দ অনুভব করলো মনে

মনে। তেমনই বাবার জন্য, মায়েদের জন্য, ছোট্ট ভাইটির জন্য মনটা ব্যাকুলও হয়ে উঠলো। তথাপি সব দুর্বলতাকে সরিয়ে ফেলে একেবারে প্রস্তুত হয়ে পড়লো সে। যে লোকটি তাকে নিশ্চিত মৃত্যু থেকে উদ্ধার করে এত বড়টি করেছে, যে দেশ এতকাল তার মুখে অন্ন দিয়েছে, যে দেশের মানুষ তাকে আপন করে নিয়েছে তাদের সঙ্গে যে নাড়ির সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। ভোলা তো যায় না তাদের!

শঙ্খমালা তন্ময় হয়ে ভাবছিল বুড়ো বদ্দির কথা। তিনি কেমন আছেন কে জানে। এই কয়েকমাস তাঁর কথা চিন্তা করারও অবকাশ পায়নি। না, আর দেরি করা চলে না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠতে যাচ্ছিল শঙ্খমালা—এমন সময় রাজাকে দেখতে এলেন মন্ত্রীমশাই। শান্তস্বরে শঙ্খমালা বললো—রাজার সঙ্গে আর কারও দেখা হবে না মন্ত্রীদাদু!

—সে কী? চমকে উঠলেন মহামন্ত্রী। জিজ্ঞাসা করলেন—মহারাজ জীবিত আছেন তো?

ম্লান হাসি হেসে শঙ্খমালা বললো—জীবিত, তবে মৃতবৎ!

—সে আবার কেমন?

—ক্যানসারের কোন ওষুধ এখনও হাতে আসেনি। মনে হয়, আগামী দিনে কেউ না কেউ ওর প্রতিষেধক আবিষ্কার করবেনই। রাজার দ্রুত অবনতি লক্ষ্য করে তাঁর জীবনকে সংরক্ষিত করেছি।

—জীবনকে কী সংরক্ষণ করা যায়? তার মানে নিশ্চিত মৃত্যুকে ঠেকানো! বিস্ময়ে হতবাক হয়ে মন্ত্রীমশাই জিজ্ঞাসা করলেন।

শঙ্খমালা বললে—যায় বৈকি?

– কতদিন ঠেকানো যাবে?

—আশা করছি বছর খানেক। যদি এরই মধ্যে ক্যানসারের ওষুধ এসে যায় তাহলে রাজা অবশ্যই দীর্ঘ জীবন লাভ করবেন।

—যদি না আসে?

—তাহলে রাজাকে আর বাঁচানো যাবে না।

মন্ত্রীমশাই হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন শঙ্খমালার দিকে। শঙ্খমালা একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করে বললো—এবার আমি ফিরে যাবো। এক বছর পরে আসবো আবার। বাবাকে বাঁচিয়ে তুলবো আর যদি পারি তাঁকে এই দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্ত করাবো। যদি না পারি তাহলে মাত্র দিন দশেকের পর রাজা মারা যাবেন।

রূপকথার কাহিনীর মতই অবিশ্বাস্য মনে হলো মন্ত্রীমাশাইর। নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। শুধু কী তাই! মন্ত্রীমশাইর মনে হলো, পুরো দশটি মাস ধরে শঙ্খমালা যা করেছে তার সবটাই অবিশ্বাস্য কল্পনার মত। শুধু রাজবাড়ীতে নয়, প্রাসাদের বাইরে হাসপাতালে হাসপাতালে। অদ্ভুত মেয়ে শঙ্খমালা! এর হাতের পরশে মৃতও জীবন পায়।

মন্ত্রীমশাই এবার কাতর হয়ে উঠলেন। বললেন—মা শঙ্খমালা, তোমার গিয়ে আর কাজ নেই। তুমি সিংহাসনে বসো, প্রজাদের পালন কর। শঙ্খমালা হেসে বললো—কেন, সিংহাসনের প্রকৃত অধিকারী যে এসে গেছে!

—আসুক গে!

—না, সিংহাসন নিয়ে আমি সবার উপরে বসে থাকতে চাই না। সবার মাঝখানে সাধারণ হয়েই থাকতে চাই।

—তুমি চলে গেলে কে দেখবে তোমার সেবা প্রতিষ্ঠান আর হাসপাতালগুলোকে?

—আপনারাই তাদের ভার নেবেন।

—রাজার ভার?

—বড় রানীমা। সব শিখিয়ে দিয়েছি তাঁকে।

মন্ত্রীমশাই বললেন—না, না, তোমার কিছুতেই যাওয়া চলবে না। তোমাকে শঙ্খদ্বীপ নয়, আর বহু রাজ্য জয় করে দেবো। তোমাকে একচ্ছত্র সাম্রাজ্ঞী করে দেবো, তুমি থেকে যাও।

শঙ্খমালা বললে—সারা পৃথিবীর বিনিময়েও ধরে রাখতে পারবেন না আমাকে।

একরকম টলতে টলতে শঙ্খমালা হাজির হলো রানী মহলে। সোনার দোলায় দুলছে সোনার বরণ রাজকুমার। ঝলমল করছে মণি-মুক্তার ঝালর। ছোট রানীমা নিজ হাতে দোলায় মৃদু মৃদু দোলা দিচ্ছেন আর ছড়া কাটছেন—

খোকা যাবে চাঁদের দেশে
আকাশ যানে চড়ে,
মায়ের সাথে কইবে কথা
আকাশ ঘাঁটি গড়ে।

শঙ্খমালার বুকটা ভরে উঠলো। খোকাকে কোলে নিয়ে আদর করলো, চুমো খেলো, তারপর রানীমার কোলে ফিরিয়ে দিয়ে বললো—মা আসি আমি!

— কোথায় যাবে!

—আগেই তো বলেছি, যেখান থেকে এসেছিলাম সেইখানেই ফিরে যাচ্ছি।

—আবার এসো!

শঙ্খমালা হাসলো। মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে অপরাপর রানীমার কাছে বিদায় নেওয়ার জন্য চলে গেল। সবাই ছোট রানীমার মত ফিরে আসার অনুরোধ জানিয়ে যে যার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

শঙ্খমালা এবার গেলেন বড় রানীমার কাছে। বড় রানীমা তন্ময় হয়ে কী যেন লিখছিলেন খাতায়। শঙ্খমালাকে দেখে খাতা বন্ধ করে উঠে পড়লেন। বুকে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে বললেন—আমার মা!

শঙ্খমালা জিজ্ঞাসা করলো—কী লিখছিলে মা?

লজ্জায় রানীমা রাঙা হয়ে উঠলেন। বললেন—ও কিছু না। খোকার জন্য একটা ছড়া লিখছিলাম।

—কেমন ছড়া দেখি!

আরও লজ্জা পেলেন রানীমা। শঙ্খমালা খাতাখানা খুলে পেতে দিল। সত্যই একটা ছড়া। রানীমা লিখেছেন—

একুশ শতক বলে কাঁদিতে কাঁদিতে
ইচ্ছে ছিল খোকাদের শতায়ু করিতে।
উপরে ওজন স্তর মাটি জল হাওয়া
বিশের শতক দিল সব বিষাইয়া।
বিশের শতক বলে দুষ কেন ভাই!
আমি নই, খোকাদের বাবারাই দায়ী।

শঙ্খমালা ছড়াটা পড়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। বললো—মা, তুমি খোকাদের নিয়ে এত ভাবো?

রানীমা বললেন—হ্যাঁ, ভাবতে শুরু করেছি।

শঙ্খমালা বললো—আমার কিন্তু ওকথা মনে আসেনি। তুমিই ভালই করলে মা। তা যাক, আমাকে এবার বিদায় দাও। আমি বিদায় নিতে এসেছি।

রানীমা ক্ষণকাল মৌন থেকে বললেন—তোমাকে ধরে রাখার কোন

অধিকার আমার নেই। যে কোন সময় তুমি যে চলে যাবে তাও জানি। তাই অনেক আগে থেকে মনটাকে পাথর করে ফেলেছি, চোখে যা জল ছিল সবটুকু ঝরিয়ে দিয়েছি, শুধু একটি অনুরোধ।

—কী অনুরোধ মা?

—তুমি আমাকে সঙ্গে কর, মা মেয়েতে যেন কোনদিন কাছ ছাড়া না হই!

—বাবাকে তাহলে কে দেখবে মা!

ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো শঙ্খমালা। এক সময় বললো—মাগো, মায়ের স্নেহ কাকে বলে জানতাম না। তোমার কাছেই প্রথম স্বাদ পেলাম। তোমাকে ছেড়ে আমিও থাকতে পারবো না। শুধু সবুর কর কটা দিন।

শঙ্খমালার বিদায়ের বার্তা বায়ুবেগে ভর করে ছড়িয়ে পড়লো রাজ্যময়। রানীমারা এলেন, কাঁদলেন। প্রজারা কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়লো শঙ্খমালার পায়ের কাছে। শুধু এলেন না বড় রানীমা।

শঙ্খমালা মাটির দিকে মুখ করে এগিয়ে যাচ্ছিল বিমানের দিকে—এমন সময় বুড়ো মন্ত্রীমশাই একরকম ছুটে এসে তার পথ রোধ করে দাঁড়ালেন। কেঁদে কেঁদে তার চোখগুলো ফুলে উঠেছে, অনুশোচনার আগুনে দগ্ধ হতে হতে শরীরটা এরই মধ্যে আধখানা হয়ে গেছে, আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে মুখের বলিরেখাগুলো। বললেন—মা মালা, তোমার উপরে সারা জীবনটা কেবল অবিচারই করে গেছি। কিন্তু আর নয়, তোমাকে যেতে দেবো না কিছুতেই। এই নাও রাজমুকুট। হাজার হাজার প্রজার সামনে তোমাকে রাজার উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করলাম।

—আমাকে বার বার কেন লোভ দেখাচ্ছেন মন্ত্রীমশাই! আমি তো বলেছি, রাজমুকুট আমার জন্য নয়।

মন্ত্রীমশাই আবেগভরা কণ্ঠে বললেন—তুমি আমার ধারণাকে ওলোট-পালট করে দিয়েছো, আমার পৌরুষকে ধুলায় মিশিয়ে দিয়েছো, আমার চোখকে খুলে দিয়েছো। যদি নিতান্তই না থাকতে চাও, তাহলে কথা দাও নাবালক রাজপুত্রের সাবালক না হওয়া পর্যন্ত তুমি রাজ্য দেখাশোনা করবে!

—তাও সম্ভব নয়।

—তাহলে রাজার অবর্তমানে রাজার প্রতিভূ হিসাবে কে চালাবে রাজ্য ?

শঙ্খমালা ভাবলো। পরে ধীর ও মৃদুস্বরে বললো—যদি আমার প্রতি এতটুকু স্নেহ আপনার থাকে, নারীর শাসনকে যদি অপছন্দ না করেন, তাহলে আপনাদের দৃষ্টির আড়ালে অন্তঃপুরের বন্দিনী বড় রানীমাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসুন রাজসভায়। বিশ্বাস করুন, অসাধারণ রাজনীতিজ্ঞা ও বুদ্ধিমতী। মানিয়ে চলার ক্ষমতাও অসীম। তাঁকেই সাম্রাজ্ঞীর মর্যাদা দান করুন, পুরুষের পৌরুষকে আরও বাড়িয়ে তুলুন।

মন্ত্রীমশাই হাঁ করে তাকালেন শঙ্খমালার দিকে। পরক্ষণে চোখটা নামিয়ে নিয়ে বললেন—তোমার উপদেশকে আদেশ বলেই গ্রহণ করলাম। রাজমুকুট দুহাতে উপরে তুলে নিয়ে ধ্বনি দিলেন—জয় বড় রানীমার জয়। সমবেত কণ্ঠে ধ্বনি উঠলো—জয় বড় রানীমার জয় !

শঙ্খমালা এগিয়ে গিয়ে হেঁট হয়ে মন্ত্রীমশাইর পদধূলি গ্রহণ করলো। এই প্রথম শঙ্খমালাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলেন মন্ত্রীমশাই। কতক্ষণ পরে কান্না থামিয়ে ধরা গলায় বললেন—কথা দাও মাঝে মাঝে এসে আমাদের খবর নেবে !

—কথা দিলাম।

সহস্র সহস্র প্রজার চোখের জলে পিছল করা পথ বেয়ে ধীর ও মন্থর গতিতে এগিয়ে গিয়ে বিমানে গিয়ে আরোহণ করলো শঙ্খমালা।